মিশন বার্তা

বর্ষ ৪২ ■ সংখ্যা ৩ ■ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে মিশনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

করোনাকালে শিক্ষায় নতুন ভাবনা

দেশের অন্যতম প্রধান বেসরকারী ক্যান্সার হাসপাতালে দেশের বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কম খরচে আন্তর্জাতিক মানের ক্যান্সার চিকিৎসার নিশ্চয়তা

Prof. Dr. A.M.M.Shariful Alam

Prof. Dr. Mahbubul Alam

Prof. Dr. Ahsan Shamim

Prof. Dr. Qamruzzaman Chowdhury

Prof. Dr. Farhad Haleem Donar

Dr. Md. Yousuf Ali

Dr. Rowshan Ara Begum

Dr. Masudul Hasan Arup

Dr. Sadia Shermin

Dr. S.M. Rokonuzzaman

Dr. Nazat Sultana

Dr. S.J. Monrohena

Dr. Shariful Islam

Dr. Samina Islam

পেডিয়েট্রিক অনকোলজি

Dr. Shamin Ara Ferdousi

Dr. Rubina Yeasmin

গাইনি অনকোলজি

Prof. Dr. Fauzia Sobhan

Lt. Col. Dr. Begum Nojneen

Dr. Farhana Ahmed

সার্জিক্যাল অনকোলজি

Prof. Dr. Anwar Hossain

Prof. Dr. A. K. Mostaque

Dr. Abu Kawsar Sarker

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল

প্লট-৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০, বাংলাদেশ

ফোন : ০৯৬৭৮০১৬৩৯১, ০২-৪৮৯৫০১৬৫, ০১৫৩১২৯১৮১০

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান www.amcghbd.org

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪২ ❑ সংখ্যা ৩ ❑ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০

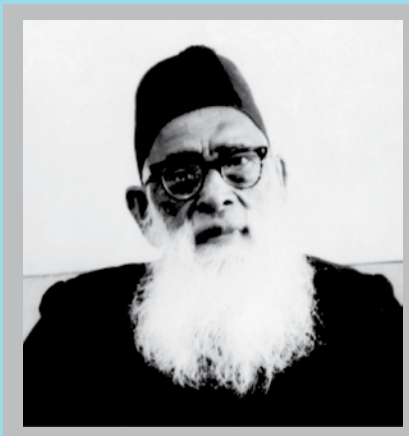

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩-১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পরিষদ
কাজী আলী রেজা
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন

সহ-সম্পাদক
মো. সাইফুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মো. আমিনুল হক

মূল্য
২৫ টাকা মাত্র

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ২০২০ বছরটি আমাদের কাছে অনন্য হয়ে আছে জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ হিসেবে। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সরকারের পক্ষ থেকে এবছরটিকে তাই মুজিববর্ষ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ বছরের ১৭ মার্চ ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র জাঁকজমক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মশতবর্ষ পালনের উদ্বোধন করা হয়। সারা দেশের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং এর বিভিন্ন সেক্টর ও অঙ্গপ্রতিষ্ঠানগুলো বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এ উপলক্ষে বছরব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি পালন করছে। এরইমধ্যে অনেকগুলো অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। সামনে আছে আরো অনুষ্ঠান। এবিষয়টি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে *বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে মিশনের শ্রদ্ধাঞ্জলি* শিরোনামের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে।

সেপ্টেম্বর মাসের সাত তারিখ ছিল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। এবারের প্রতিপাদ্য হল ‘কোভিড-১৯: সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা’। বিশ্বের সংকটময় একটি পরিস্থিতির আলোকেই এবার নির্ধারণ করা হয়েছে দিবসের প্রতিপাদ্য। করোনা মহামারীর কারণে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বিরাট সমস্যা তৈরি হয়েছে। বহুদিনের প্রচেষ্টায় প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়া কমানো হয়েছে। কিন্তু করোনার কারণে শিক্ষায়তন সব বন্ধ এবং শিশুদের ঘরে থাকতে হচ্ছে বলে লেখাপড়া বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। সরকার অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর গুরুত্ব দেওয়া শুরু করেছে। তবে ইন্টারনেট সুবিধা বা ডিজিটাল ডিভাইস না থাকার কারণে অনেকেই অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে পারছে না। মিশন বিষয়গুলো বিবেচনা করে লাইভ ক্লাস, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ক্লাস ও হোম ভিজিট করে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ এসব কার্যক্রমের ওপর বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে করোনাকালে সাক্ষরতায় নতুন ভাবনা শীর্ষক প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে।

অক্টোবরে শিক্ষক দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়-ও শিক্ষক উন্নয়ন সংক্রান্ত বলে বিষয়টি এই সংখ্যায় অন্তর্ভূক্ত করা হলো প্রতিবেদন হিসেবে। সাক্ষরতা দিবসের প্রচ্ছদ কাহিনীর সাথে পাঠকরা একইসাথে পড়তে পারবেন।

এবার বিশেষ একটি প্রতিবেদন রয়েছে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকরের প্রসঙ্গে। জরিপের ওপর ভিত্তি করে রচিত প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে গণপরিবহনে এবং বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রায় শতভাগ মানা হচ্ছে না।

করোনার কারণে এই সংখ্যাটিও কেবল সফ্ট কপিতে সাজিয়ে আপলোড করা হল। পরিস্থিতি পূর্ণ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াতেই প্রকাশিত হবে মিশন বার্তা।

করোনা সংক্রমণ এখনও উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছে। সামনের শীতে এর প্রকোপ আরো বেড়ে যেতে পারে। তাই মাস্ক পরবেন এবং স্বাস্থবিধি মেনে চলবেন। এটা প্রয়োজন আপনার এবং সকলের কল্যাণের জন্য।

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনী ৫-৭ / ৮-১০
বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে মিশনের শ্রদ্ধাঞ্জলি লিখেছেন মো. জাহাঙ্গীর আলম
করোনাকালে শিক্ষায় নতুন ভাবনা লিখেছেন মো. রিজওয়ান আলম

১১
আলোর পথযাত্রী খাদেম আনছারউদ্দীন আহমদ
ইকবাল মাসুদ

১৬
দরিদ্র জনপদে অর্থনৈতিক উন্নয়নে মিশন
মো. আসাদুজ্জামান

১৯
তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না
গণপরিবহণ ও রেস্তোরাঁ মালিকরা
মো. মোখলেছুর রহমান

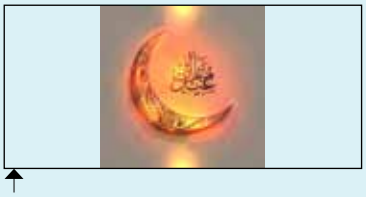

২২
মুসলিম জীবনে হিজরী সন ও চান্দ্র
তারিখের গুরুত্ব
মুফতী শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

২৬
তামাকমুক্ত দেশ গড়তে আরো সক্রিয় হবে
এনজিও ব্যুরো : মহাপরিচালক

মিশন প্রতিষ্ঠাতার দর্শন ৩-৪
প্রতিবেদন ১৪-২১
স্বাস্থ্য ২৪-২৬
মানবাধিকার ২৭
শিক্ষা ২৮
স্মরণ ২৯

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আমাদের বাংলা প্রেস, ৩২/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল : dambgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

শিক্ষাদান প্রণালী : শিক্ষকের করণীয়

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা

পদার্থ, চিত্র বা আদর্শ সাহায্যে শিশুকে প্রথম শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষণীয় বিষয়টি শিশুকে দর্শন বা স্পর্শ করিতে দেওয়া আবশ্যক, পরে গল্পচ্ছলে ঐ পদার্থ সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য শিক্ষা দেওয়া উচিত। যে পর্য্যন্ত পদার্থটি সম্বন্ধে তাহার বিবরণগুলি দৃঢ়ীভূত না হইবে, সে পর্য্যন্ত অন্য বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে না।

মানসিক শক্তির পরিপুষ্টি শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। শিশুর মনোবৃত্তিগুলি এরূপে পরিচালিত করিতে হইবে যে, এই শক্তির উন্নতি সাধিত হইতে পারে। যে শিক্ষা দ্বারা এই শক্তি পরিপুষ্ট না হয়, তাহা প্রকৃত শিক্ষাবাচ্য নহে। কতকগুলি বিষয় কণ্ঠস্থ করিলে কোন শক্তি জন্মে না। পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা কখনও শিক্ষকের লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। জ্ঞানদান ও মানসিক শক্তির পরিপুষ্টি তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য হইবে। শিক্ষক কেবল বিদ্বান হইলেই শিক্ষাকার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয় না। শিক্ষকের অনেকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক, যথা- উপযোগিতা, প্রবৃত্তি ও আগ্রহ, শিক্ষার্থীর প্রতি সহানুভূতি, হৃষ্টচিত্ততা, শাসনক্ষমতা, শিক্ষাকৌশল ও উপস্থিতবুদ্ধি।

শিশুর স্বভাব লক্ষ্য করিয়া শিক্ষাদান করিতে হইবে। উহার বাহ্যজ্ঞান, ধারণশক্তি প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া শিক্ষককে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে। জ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; যাহাতে সকল ইন্দ্রিয়েরই পরিচালনা হয়, তৎপ্রতি শিক্ষক দৃষ্টি রাখিবেন। আমাদের অধিকাংশ জ্ঞান চক্ষু ও কর্ণ সাহায্যে জন্মিয়া থাকে, সুতরাং এই দুইটি ইন্দ্রিয়ের বিশেষ অনুশীলন প্রয়োজনীয়। শিশুর প্রথম জ্ঞান বস্তুসাপেক্ষ হওয়া আবশ্যক। বস্তু ব্যতিরেকে শিশুকে কোন শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। শিশু প্রকৃত ভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে কি না, ইহা নানাপ্রকার প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে। অস্পষ্ট ভাব ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান বিঘ্নদায়ক। শব্দ পরিত্যাগ করিয়া শব্দবোধক ভাবে প্রতি চিন্তাশক্তিকে পরিচালিত করাইতে হইবে। দৃষ্টি শব্দের উপর চালিত হইবে সত্য কিন্তু চিন্তা শব্দঘটিত অর্থের উপর ধাবিত হইবে। পরিশেষে শব্দের বিনা সাহায্যে চিন্তাশক্তি এক ভাব হইতে ভাবান্তরে আকৃষ্ট হইবে। ভাষা ও জ্ঞান দুইটি পৃথক বস্তু। উভয়েরই উন্নতি বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষা প্রথমে বস্তুবিষয়ক ও ক্রমে ভাববিষয়ক হইবে। শিশুর প্রধান জ্ঞান অপরের সাক্ষ্য সাপেক্ষ হওয়া উচিত নহে। শিশু স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিয়া দৃষ্টান্ত হইতে সংজ্ঞা গঠন করিবে। ইহাতে উহার জ্ঞানের প্রসার হইবে।

সহজ হইতে জটিল ও জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাত বিষয়ে অগ্রসর হওয়া সুশিক্ষার অন্যতম প্রণালী। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান হইতে ক্রমে ইন্দ্রিয়ের অলব্ধ জ্ঞানলাভের চেষ্ট করিতে হইবে। দৃষ্ট বস্তুর জ্ঞানের সাহায্যে দৃষ্টি বহির্ভূত বস্তুর জ্ঞান জন্মাইতে হইবে। ইহাতে চিন্তাশক্তি পরিপুষ্ট হইবে।

কোন কোন সময়ে ছাত্র বালকদিগকে এক সঙ্গে উত্তর দিতে উৎসাহিত করিতে হইবে, ইহাতে লাজুক ও ভীত ছাত্র ক্রমে সাহসী হইবে। কোন নির্দ্দিষ্ট বালককে সর্ব্বদা উত্তরের জন্য মনোনীত করা নিষিদ্ধ। বিশেষ কারণ ব্যতীত শিক্ষক স্বয়ং উত্তর বলিয়া দিবেন না; তবে আবশ্যক হইলে কখন কখন ইঙ্গিতমাত্র দিতে পারেন।

পদার্থ, চিত্র বা আদর্শ সাহায্যে শিশুকে প্রথম শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষণীয় বিষয়টি শিশুকে দর্শন বা স্পর্শ করিতে দেওয়া আবশ্যক, পরে গল্পচ্ছলে ঐ পদার্থ সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য শিক্ষা দেওয়া উচিত। যে পর্য্যন্ত পদার্থটি সম্বন্ধে তাহার বিবরণগুলি দৃঢ়ীভূত না হইবে, সে পর্য্যন্ত অন্য বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে না।

শিশু বয়স্ক হইলে উহার স্মৃতিশক্তি পরিপুষ্ট করিতে হইবে। ঐ সময়ে তাহাকে কবিতা, নামতা, আর্য্যা প্রভৃতি কণ্ঠস্থ করাইতে হইবে। দশ বৎসর বয়স অতীত হইলে ক্রমে যুক্তি ও তর্কশক্তি পরিচালনা করিতে হইবে। পদার্থ সম্মুখে না রাখিয়া সেই সম্বন্ধে মৌখিক আলোচনা করিতে হইবে।

সুপ্রশ্ন শিক্ষার একটি প্রধান অবলম্বন। যে শিক্ষক সুপ্রশ্ন করিতে পারেন, তাঁহার কৃতকার্য্যতা স্থিরনিশ্চয়। ছাত্র হইতে প্রশ্নের সমস্ত উত্তর লইতে চেষ্টা করিতে হইবে। অনেক স্থানে শিক্ষক পরিশ্রম করিয়া থাকেন, কিন্তু ছাত্র নির্ব্বাক ও নিষ্কাম থাকে। ইহাতে অলসতা বৃদ্ধি পায় ও কার্য্যাত্মক প্রবৃত্তির বিনাশ হয়। ছাত্রকে আত্মাবলম্বন শিক্ষা দিতে হইবে। ইহাতে অনুসন্ধিৎসা বাড়িতে ও নূতন শক্তির সঞ্চার হইবে। এক বাক্য দ্বারা বারংবার একই প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ। ইহাতে বৃথা সময় নষ্ট হয় ও ছাত্রের মনোযোগের হ্রাস হয়। এমন কোন প্রশ্ন করিতে হইবে না, যাহার উত্তরে "হ্যাঁ" বা "না" বলিলেই চলিতে পারে। এইরূপ প্রশ্ন দ্বারা শিক্ষার অপব্যবহার হয় ও ছাত্রের ঔৎসুক্য নিরস্ত হয়। প্রশ্ন করিবার সময় শিক্ষক সমস্ত ক্লাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিবেন, কিঞ্চিৎ পরে কোন ছাত্রকে উত্তরের জন্য মনোনীত করিবেন। ছাত্রদিগকে ক্রম অনুসারে প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ। কখন কখন ছাত্রবিশেষকে প্রশ্ন করিতে বলিতে হইবে। যে ছাত্র উত্তর না দিতে পারিবে, প্রশ্নকারী উত্তর দিয়া তাহার স্থান অধিকার করিবে। এইরূপ প্রশ্নে ছাত্রগণ আমোদ উপভোগ করবে। উত্তর খাঁটি ও সম্পূর্ণ না হইলে অগ্রাহ্য হইবে। অর্দ্ধ উত্তর সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য। পূর্ণবাক্যে উত্তর দেওয়া কখনো কখনো আবশ্যক। ভাল উত্তর পাইলে প্রশংসাবাদ দেওয়া বাঞ্ছনীয়। উহাতে অপর ছাত্রের কৌতূহল বাড়ে। অসম্পূর্ণ উত্তর সর্ব্বসমক্ষে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। কাহারও উত্তর অগ্রাহ্য হইলে কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ অসঙ্গত। অভদ্রতার সহিত উত্তর করিলে উত্তরকারীকে নিরুৎসাহ ও লাঞ্ছিত করিতে হইবে। বারংবার প্রশ্ন করিবার পরও ছাত্রগণ উত্তর দিতে অসমর্থ হইলে, শিক্ষিতব্য বিষয় পুনরালোচনা করিতে হইবে। কোন কোন সময়ে ছাত্র বালকদিগকে এক সঙ্গে উত্তর দিতে উৎসাহিত করিতে হইবে, ইহাতে লাজুক ও ভীত ছাত্র ক্রমে সাহসী হইবে। কোন নির্দ্দিষ্ট বালককে সর্ব্বদা উত্তরের জন্য মনোনীত করা নিষিদ্ধ। বিশেষ কারণ ব্যতীত শিক্ষক স্বয়ং উত্তর বলিয়া দিবেন না; তবে আবশ্যক হইলে কখন কখন ইঙ্গিতমাত্র দিতে পারেন।

কেবল পরিশ্রমী হইলে সুশিক্ষক হওয়া যায় না। যে প্রণালী অবলম্বন করিলে শিক্ষণীয় বিষয় সহজবোধ্য হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। শিক্ষা কষ্টসাধ্য হইলে কার্যকরী হয় না। যাহাতে শিক্ষকের বৃথা সময় নষ্ট না হয়, অথচ ছাত্রদিগের মানসিক শক্তির উৎকর্ষ ঘটে তৎপ্রতি শিক্ষকের দৃষ্টি থাকা উচিত।

বস্তু ব্যতিরেকে শিশুকে কোন শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। শিশু প্রকৃত ভাব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে কি না, ইহা নানাপ্রকার প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে। অস্পষ্ট ভাব ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান বিঘ্নদায়ক। শব্দ পরিত্যাগ করিয়া শব্দবোধক ভাবে প্রতি চিন্তাশক্তিকে পরিচালিত করাইতে হইবে।

কোন একটি বিষয়ের অত্যধিক আলোচনা করিলে মনোযোগ শক্তির হ্রাস হয়। সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পাঠ্য বিষয়গুলি পর্য্যায় পরিবর্ত্তন করিলে মনের প্রফুল্লতা জন্মে ও জড়তা দূর হয়। অনেক সময় ব্যাপিয়া কোন পাঠ দেওয়া সঙ্গত নহে, ইহাতে মনোবৃত্তি শিথিল হইয়া পড়ে। ব্যায়াম এই শিথিলতা দূর করে ও পুনঃ পাঠের জন্য ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করে।

কৃতকার্য্যতার জন্য শিক্ষকের পক্ষে কষ্টসহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, ভদ্রতা, অমায়িকতা, গাম্ভীর্য্য ও দয়া একান্ত আবশ্যক। এক কথায় বলিতে হইলে, শিক্ষকের আদর্শ পুরুষ হওয় উচিত। তাঁহার বিদ্যা ও চরিত্র সকলের অনুকরণীয় হইবে। অনেক শিক্ষক শাসনসংরক্ষণ হেতু চীৎকার করিয়া থাকেন, ইহা দূষণীয় হইবে। শিক্ষকের ভ্রূভঙ্গি ছাত্রের মনে ভয়ের সঞ্চার করিবে ও ঈষৎ হাস্য পুরস্কারস্থানীয় হইবে। শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের দক্ষতা ও অভাব ভালরূপ দেখিবে। এক দিকে তাহার স্বভাবের প্রতি ও অপর দিকে তাহার জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষণীয় বিষয়ের অবতারণা করিবেন। তাঁহাকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি ছাত্রগণের শিক্ষক, শাসনকর্তা ও বন্ধু।

ছোট বালকদিগের শিক্ষার জন্য বক্তৃতা পদ্ধতি উপযোগী নহে। উহাতে ছাত্রদিগের আত্মাবলম্বনের লোপ হয়, বুদ্ধিশক্তির খর্ব্বতা হয় ও অভিনিবেশের হ্রাস হয়। কলেজে বহু ছাত্র একত্রে সমন্বিত হইলে অধ্যাপকগণ বক্তৃতার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। সুকোমলমতি শিশুর পক্ষে ইহা উপাদেয় নহে।

অনেক শিক্ষক স্বীয় পরিচ্ছদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। সাহেব না সাজিয়াও অনেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করিতে পারেন। শিক্ষকের স্থান আদর্শস্থানীয়, সুতরাং তাঁহার মলিন বস্ত্র, অপরিষ্কৃত জুতা, তৈলাক্ত টুপী শোভা পায় না। ব্যহ্যিক পারিপাট্য আভ্যন্তরীণ চরিত্রের পরিচায়ক। ইহাতে ছাত্রেরা স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়। কোন কোন শিক্ষক ক্লাসের মধ্যে বিশ্রীভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন, ইহা ছাত্রদিগের পক্ষে অনুকরণীয় নয়। শিক্ষকের অধিক সময় "এটেন্‌সন্" অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকা উচিত। দেওয়ালে ঠেস দেওয়া, চেয়ারে পা তুলিয়া বসা বা টেবিলে পা উঠাইয়া দেওয়া শিক্ষকের পক্ষে নিষিদ্ধ। এই সমস্ত কু-অভ্যাস বালকদিগের অনুকরণীয় হওয়া উচিত নহে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষে মিশনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

মো. জাহাঙ্গীর আলম

এ বছর বাংলাদেশের মানুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ পালন করছে। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে এবছরটিকে তাই মুজিববর্ষ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং এর বিভিন্ন সেক্টর ও প্রতিষ্ঠানগুলো বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এ উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে যে বৈশ্বিক মহামারী পুরো বিশ্ব পরিস্থিতির ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে তারই কারণে মাঝখানে অনেক কার্যক্রমই বাধাগ্রস্ত হয়, এর মধ্যেও যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

১০ জানুয়ারি ২০২০ কক্সবাজারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

ক্ষণগণনা

১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর ক্ষণগণনা কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এতে অন্যান্যদের পাশাপাশি স্থানীয় নানাবিধ সংকটের মাঝেও অংশ নেয় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কক্সবাজার অফিস।

ব্যানার, ফেস্টুন ও ফ্লাইয়ার প্রদর্শন

মার্চ ২০২০ এর শুরু থেকেই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়সহ সকল অফিসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ও মুজিব শতবর্ষের লোগো সম্বলিত ব্যানার ও ফেস্টুন প্রদর্শন করা হয় এবং এ বছরের সকল ইভেন্টে মুজিব শতবর্ষের ফ্লাইয়ার প্রদর্শিত হয়ে আসছে। একইসাথে টানানো হয়েছে প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার।

পুষ্পস্তবক অর্পণ

মার্চ মাসে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বিশ্বম্ভরপুর ও দক্ষিণ সুনামগঞ্জ এরিয়া অফিসে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে অংশ নেন দুই উপজেলার ইউএনও।

দুর্নীতি বিরোধী জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা

দুনীতি দমন কমিশন (দুদক) এবং অক্সফাম-বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীদের দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করার জন্য সারাদেশে দুর্নীতি বিরোধী জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা'২০২০ আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় উপজেলা এবং জেলার শ্রেষ্ঠ দলগুলো নিয়ে বিভাগীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি বছরব্যাপী রচনা প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্ট সবার অংশগ্রহণে দুর্নীতি বিরোধী ও সুশাসন সম্পর্কিত মতবিনিময় সভারও আয়োজন করা হবে।

এই সমঝোতার অধীনে প্রথম ধাপে সারা দেশের ২৬,২১৩ (ছাব্বিশ হাজার দুইশত তের) টি মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দুর্নীতির প্রতি নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে 'দুর্নীতি বিরোধী জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২০' অনুষ্ঠিত হবে।

এই স্বেচ্ছাসেবকগণ সংশ্লিষ্ট জেলায় এবং উপজেলায় বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনে জাতীয় পর্যায়ে নিয়োগকৃত স্বেচ্ছাসেবক, এবং দুদক ও অক্সফ্যাম কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিনিধির পরামর্শ অনুযায়ী স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষা কর্মকর্তা, দুদক কর্মকর্তা ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সহযোগিতায় দায়িত্ব পালন করবে। বিদ্যালয়ের আন্তঃশ্রেণী প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত সেরা তিনজন তার্কিকের সমন্বয়ে এই স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন করা হবে।

বিশেষ আলোচনা সভা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় মিশনের বিভিন্ন অফিস ও কর্মএলাকা।।

মিশনের ডিএফইডি ১০৬টি ব্রাঞ্চ অফিসের ৭,২৬৪টি দলে সদস্যদের উপস্থিতিতে সাপ্তাহিক সভায় বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শের ওপর আলোচনা করা হয়। এতে ভবিষ্যত প্রজন্ম জাতির পিতার আদর্শ, সংস্কৃতি চর্চা, খেলাধুলা, সামাজিকতা, মানবতা, কর্মতৎপরতা, মহত্ব, দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিদীপ্ত ভাবনা সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছে , যা তাদের ভবিষ্যত জীবনের সফলতার পাথেয় হিসাবে কাজ করবে। স্বাস্থ্য সেক্টর করোনা মহামারীকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত "করোনা সংলাপ" শিরোনামে ২২টি অনলাইন ডিসকাশনের আয়োজন করেছে যার প্রতিটিতে 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন' বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কেক কাটা

ডিএফইডি ও স্থানীয় প্রশাসন যৌথভাবে কেক কাটা ও আলোচনাসভার আয়োজন করে। শিক্ষা সেক্টরের ৫টি মাল্টিপারপাস সেন্টারে কেক কাটার

মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প

১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেক্টরের পক্ষ থেকে সবকটি (৬টি) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে এবং সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে ফ্রি স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়। ৬৫৮ জন হেলথ-চেক আপ সেবা পান। ২টি সিজারিয়ান এবং ৩টি নরমাল ডেলিভারীও বিনামূল্যে করানো হয়।

UPHCSDP-II, DSCC PA-3 all 06 PHCC and CRHCC (Nagar Matri Sadan) গুলিকে বর্ণাঢ্য আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয় এবং সকল আউটডোর পেশেন্ট ও ডেলিভারী পেশেন্টকে বিনামূল্যে সেবা দেওয়া হয়।

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

১৪১টি সিএলসি ও ২টি ড্রপ-ইন-সেন্টারে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মোট অংশগ্রহণকারী ছিল ৪,৭২৬ জন।

দেওয়াল পত্রিকা

মিশন পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষায়তনে শিক্ষার্থীরা জাতির পিতার জন্মশতবর্ষকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর অনুসরণীয় কর্মময় জীবনের নানান কি তুলে ধরে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করে। এ বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সার্বিক সহায়তা দেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা মোহাম্মদপুরের পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের মধ্যে ঈদের পোষাক বিতরণ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

স্বাস্থ্য সেক্টরের আয়োজনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রোথ সেন্টার ও স্কুলে সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীগণ "আমাদের পরিবর্তন দরকার" শিরোনামে পথনাটক মঞ্চস্থ করে। কলাপাড়া, মিরজাগঞ্জ ও পটুয়াখালীর স্কুলগুলোতে ১৫০০ শিক্ষার্থী এতে অংশগ্রহণ করে। এই সকল ইভেন্টে মুজিব শতবর্ষের ফ্লাইয়ার প্রদর্শন করা হয়।

মার্চ ২০২০ এ শিক্ষা সেক্টরের আওতায়ও শিক্ষার্থীগণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। ১টি সিএলসি ও ২টি ড্রপ-ইন-সেন্টার সাংস্কৃতিক

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, কিশোরগঞ্জ

অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। AITVET এর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ মিলে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার তৈরি

AITVET এর লাইব্রেরীতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার তৈরি করা হয়েছে, সেখানে রয়েছে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ছবি দিয়ে তৈরি একটি শুশোভিত ব্যানার এবং বই, যা থেকে শিক্ষার্থীগণ জানতে পারছে মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন ও দেশের ইতিহাসকে।

খাবার বিতরণ

এপ্রিল ২০২০ মাসে এক হাজার ২০০ জন পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের মধ্যে দুপুরের খাবার বিতরণ করা হয়।

বৃক্ষরোপণ

মুজিব শতবর্ষের স্মৃতি রক্ষার্থে মিশনের বিভিন্ন অফিসে এ পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক ফলজ, বনজ ও ওষধী বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে, এছাড়া সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তাদের স্ব স্ব বাড়ির আঙিনায় বৃক্ষরোপণ করতে।

বিশেষ করে উত্তরা ক্যান্সার হাসপাতালে, শেল্টার হোম ঠিকানায়, শিশুনগরীতে স্টাফ ও শিক্ষার্থীরা বৃক্ষ রোপণ করেছেন।

পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের মধ্যে ঈদের পোশাক বিতরণ

জুলাই ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় মোহাম্মদপুরের পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের মধ্যে ঈদের পোশাক বিতরণ করা হয়। ছেলেদের জন্য একটি স্কুল ব্যাগ, পাঞ্জাবী, প্যান্ট, একজোড়া জুতা, একটি ক্যাপ এবং প্রত্যেকের জন্য একটি মাস্ক এবং মেয়ে শিশুদের জন্য ছিল, একটি স্কুল ব্যাগ, একটি ফ্রক, একজোড়া জুতা, একটি হিজাব এবং প্রত্যেকের জন্য একটি মাস্ক।

***মো. জাহাঙ্গীর আলম**, উপ-পরিচালক/ হেড অব ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডিআরআর সেক্টর*

কোভিড-১৯ বিষয়ে শিক্ষাবিদদের ভূমিকা শীর্ষক অনুষ্ঠানের একাংশ

করোনাকালে শিক্ষায় নতুন ভাবনা

মো. রিজওয়ান আলম

এবার বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় 'কোভিড-১৯ঃ সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন - শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদ্‌দের ভূমিকা'। এই আলোকে ৮ সেপ্টেম্বর দিবসটি পালন করা হয় সারা বিশ্বে। বাংলাদেশেও দিবসটি পালিত হয়েছে করোনার সংক্রমণের মধ্যেই। দিবসটির প্রতিপাদ্য সামনে রেখেই শুরু হয়েছে নতুন কর্মসূচি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এ বিষয়ক কার্যক্রম এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে এ প্রতিবেদন তৈরি করেছেন

মো. রিজওয়ান আলম

সাক্ষরতা একটি দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার সঙ্গে সাক্ষরতা আর সাক্ষরতার সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যে দেশের সাক্ষরতার হার যত বেশি সেদেশ তত উন্নত। সাক্ষরতার গুরুত্ব বিবেচনা করে সারা বিশ্ব ১৯৬৬ সাল থেকে ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে পালন করে আসছে। এ দিবসটি পালনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষকে আমরা বলতে চাই, সাক্ষরতা একটি মৌলিক অধিকার এবং সর্বস্তরের শিক্ষার ভিত্তি বিদ্যমান। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হচ্ছে। বিগত এক দশকে বাংলাদেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এটা আমাদের জন্যে বড়ই আশার সংবাদ। কিন্তু একটি দেশের জন্য ৭৪ .৭ শতাংশ শিক্ষার হার নিয়ে সন্তুষ্ঠ থাকা যায় না। একটি দেশের ১০০ শতাংশ জনগণ শিক্ষিত নাহলে সে দেশের উন্নতি বিভিন্নভাবে বাধাপ্রাপ্ত হবে এটাই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশসহ সারাবিশ্ব আজ কোভিড-১৯ এর মহামারীর করাল থাবায় জর্জরিত এবং আতঙ্কিত। বিশ্ব আজ থমকে গেছে। থমকে গেছে সকল প্রকার উন্নয়ন। এই অবস্থায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বিশ্ব তথা বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা। এবারের প্রতিপাদ্য তাই **"কোভিড-১৯ঃ সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন - শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদ্‌দের ভূমিকা।"** প্রতিপাদ্যটি সময়ের বিবেচনায় যথাযোগ্য-ই। শিক্ষাবিদ্‌দের জন্যে এখন নতুন চিন্তা করার সময় এসেছে আর তা করতে হবে া এখনই। ভাবতে হবে কীভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে সবার জন্যে সহজ করা যায় এবং নিরাপদ করা যায়।

কোভিড-১৯ সাক্ষরতা কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা চলমান রাখার জন্যে দূরশিক্ষণ তথা ডিজিটাল ব্যবস্থায় শিক্ষাদান পদ্ধতি গ্রহণ করছে। প্রশ্ন হচ্ছে এর থেকে বাংলাদেশের সকল শিক্ষার্থী কী লাভবান হচ্ছে? সকল শিক্ষার্থী এই সুবিধাটা ভোগ করতে

পারছে? একেবারেই সহজ উত্তর হচ্ছে "না"। বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত হত দরিদ্র জনগোষ্ঠির পুরো অংশটিই আজকে এই সুবিধা ভোগ করতে পারছেনা। শহর কেন্দ্রিক কিছু শিক্ষার্থী ডিজিটাল শিক্ষা সুবিধা পেলেও পাচ্ছেনা গ্রাম কেন্দ্রিক বা যে এলাকায় এখনো প্রযুক্তিগত সুবিধা নেই সেখানে বঞ্চিত হচ্ছে তারা। আমাদেরকে শুধু বক্তৃতা আর সেমিনার নয়, সময় এসেছে শিক্ষাবিদ্দের সমসাময়িক বিষয়ে চিন্তা করার। আর সেসব চিন্তা নয় দ্রুত বাস্তবায়িত করার। মনে রাখতে হবে এখনো সারা বিশ্বের একাংশ নিরক্ষর রয়েছে।

শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার নিয়ে দুশ্চিন্তা গত ২ অক্টোবর ২০২০ দৈনিক কালের কণ্ঠের একটি লেখার ওপর চোখ আটকে যায় অনেকের। কলামটির হেড লাইন ছিল এরকম **"অনেক শিক্ষার্থী আর স্কুলেই ফিরবে না"** সেখানে বলা হচ্ছে "করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সাত মাস ধরেই বন্ধ রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অনেক শিক্ষার্থীরই স্কুলের সঙ্গে তেমন কোনো যোগাযোগই নেই। তাদের অনেকেই আর স্কুলে ফিরবে না বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তাই ঝরে পড়ার হার নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। গত বছর প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার ছিল ১৭.৯ শতাংশ আর মাধ্যমিকে এই হার ছিল ৩৭.৬২ শতাংশ। ঝরে পড়ার পেছনে অন্যতম কারণ দারিদ্র্য, বাল্যবিয়ে ও আবাসস্থল ত্যাগ। বিশেষ করে শহরের বস্তিবাসী এবং চর ও হাওর অঞ্চলের শিশুরাই বেশি ঝরে পড়ে। করোনার কারণে এসব পরিবারে দারিদ্র্য আগের চেয়ে বেড়েছে। বাংলাদেশের ২০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। করোনার কারণে আরো ২০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নামতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সম্প্রতি পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) ও ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) এক যৌথ গবেষণায় দেখা যায়, করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে তৈরি হওয়া পরিস্থিতির প্রভাবে শহরের নিম্ন আয়ের মানুষের আয় কমেছে ৮২ শতাংশ আর গ্রামাঞ্চলের নিম্ন-আয়ের মানুষের আয় কমেছে ৭৯ শতাংশ। অনেক ক্ষেত্রে তারা কোনো রকমে তিন বেলা খেতে পারলেও পুষ্টিমান রক্ষা করতে পারছে না।"

শিখন-শেখানো কৌশল ওপরের এই কথাগুলো বিশ্লেষণ করলে সহজেই অনুমিত হয় বর্তমান শিক্ষা পরিস্থিতি কতটা নাজুক অবস্থায় রয়েছে। ঠিক এই কথাগুলোই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে যারা শিক্ষা সেক্টরের সাথে কাজ করছেন তারা আরো আগে থেকেই বলে আসছেন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম যাদের নিয়ে পরিচালনা হয় তারা আর্থিকভাবে খুবই দুর্বল। কোয়ারেন্টাইন অথবা বাসায় থেকে এই শিক্ষার্থীরা বা তাদের অভিভাবকরা আদৌ কি স্বাস্থ্যবিধি মানছেন? পেটের দায়ে অথবা প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা মেটাতে তাদের বাইরে বের হতে হচ্ছে। সাথে কোমলমতি শিশুরাও। বাবা মা দু'জনই যখন জীবিকার অন্বেষণে বাইরে যান তখন এই শিশুরা আদৌ বাসায় থাকছেনা। তাদের সেই রকম সচেতনতাও নেই। পাশাপাশি বাবা মা যখন সংসারের ঘানি টানতে পারছেননা তখন শিশুদেরকে বাধ্য হয়ে বাবা মায়ের পাশাপাশি কাজ করতে হচ্ছে। এতে তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি আরো বাড়ছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইতোমধ্যেই এই বিষয়গুলো উপলব্ধি করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

> বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হচ্ছে। বিগত এক দশকে বাংলাদেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এটা আমাদের জন্যে বড়ই আশার সংবাদ। কিন্তু একটি দেশের জন্য ৭৪ .৭ শতাংশ শিক্ষার হার নিয়ে সন্তুষ্ঠ থাকা যায় না। একটি দেশের ১০০ শতাংশ জনগণ শিক্ষিত নাহলে সে দেশের উন্নতি বিভিন্নভাবে বাধাপ্রাপ্ত হবে এটাই স্বাভাবিক।

লাইভ ক্লাস লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা সেক্টরের শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদেরকে ইউসিএলসিতে এনে পাঠ দান করছেন। সে ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব মেনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সকল শিক্ষার্থীকে একদিনে ক্লসে না এনে রুটিন করে শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাসে আনা হচ্ছে এবং ডিসইনফেক্ট করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

মোবাইল ফোন নির্ভর শিক্ষা কার্যক্রম যেসকল শিক্ষার্থী ইউসিএলসি থেকে একটু দূরে বাস করে বা তাদের ইউসিএলসিতে আসতে স্বাস্থ্যঝুঁকি আছে তাদেরকে আমাদের শিক্ষিকারা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পাঠদান করছেন। ফোন কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত সময়ে একসাথে চারজন শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা হয়। সেই ক্ষেত্রে অভিভাবককেও বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে এবং তারা সচেতন হচ্ছেন।

রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শিশুরা

হোম ভিজিটের মাধ্যমে পাঠ দান এই কার্যক্রমে শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের বাসায় যাচ্ছেন এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করছেন এবং তাদের পড়া-লেখার অগ্রগতি তত্ত্বাবধান করছেন।

টেলিভিশনের মাধ্যমে পাঠদান যে সকল শিক্ষার্থীর বাসায় টেলিভিশন রয়েছে তাদেরকে

সরকারিভাবে যে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে তার সাথে সম্পৃক্ত করতে নিয়মিত রুটিন সরবরাহ ও ফলোআপ করা হচ্ছে।

অফলাইন এডুকেশন কন্টেন্ট ব্যবহার যে সকল শিক্ষার্থীর বাসায় টেলিভিশন বা মোবাইল সুবিধা নেই তাদেরকে কনটেন্ট ডাউনলোড করে সরবরাহ করা হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরা সেই অনুযায়ী পড়া-লেখা করছে কিনা ফলোআপ করা হচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বাসায় গিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করছেন। এছাড়াও স্বাস্থ্যবিধি মেনে জেএসসি ও পিইসি শিক্ষার্থীদের ইউসিএলসিগুলোতে পাঠদান করছেন। যাতে করে এই শিশুরা আবারো ঝরে না পড়ে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমছে এবং সচেতনতাও বাড়ছে। তারা মাস্ক ব্যবহার করছে এবং অনলাইন শিক্ষা পদ্ধতির সাথে পরিচিত হচ্ছেন।

শিক্ষাবিদদের ভূমিকা গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধূরী কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘‘করোনায় যে অবস্থা তাতে ঝরে পড়ার হার বাড়বে। করোনার এই ক্রান্তিকালে দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের কাজে লাগিয়ে বাড়তি আয়ের চেষ্টা করবে। বাল্যবিয়ে বেড়ে যাবে। বিশেষ করে চর, হাওর ও শহরের বস্তি অঞ্চলের শিশুরা বেশি সমস্যায় পড়বে। শুধু প্রাথমিক-মাধ্যমিকই নয়, যেসব শিক্ষার্থী প্রাইভেট-টিউশনি করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত, তাদের মধ্যেও ঝরে পড়ার হার বাড়বে।’’ এই শিক্ষাবিদ পরামর্শ দিয়ে বলেন, ‘‘ঝরে পড়ার হার কমাতে সরকারকেই বেশি উদ্যোগী হতে হবে। এ জন্য এবারের বাজেটে শুধু শিক্ষা খাতেই ১৫ শতাংশ বরাদ্দ রাখার কথা আমরা বলেছি। যেসব মেগাপ্রকল্প আছে, যেগুলোকে নিয়ে ধীরে চলা যেতে পারে, সেগুলো থেকে বরাদ্দ কমানো যেতে পারে। তবে কোনোভাবেই স্বাস্থ্যের ঝুঁকি নেওয়া যাবেনা, শিক্ষার ক্ষতি করা যাবেনা। দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের স্কুলে ধরে রাখতে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সরকারকেই নিতে হবে।’’

ইউনিসেফ-এর ইসিডি স্পেশালিস্ট মো. মহসিন বলছেন ‘‘আমরা কেউই কোনোদিন ভাবিনি এভাবে আমাদেরকে সাক্ষরতা দিবস পালন করতে হবে। এ ধরনের অবস্থার জন্যে সরকার কিংবা এনজিও কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। এটি আমাদের জন্যে একটি লার্নিং। আগামীতে শুধু কোভিড নয় যে কোন নিও-নরমাল সিচুয়েশানের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষকদেরকে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ প্রদান, নতুন টেকনোলজির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং আমাদের প্ল্যাটফর্ম চেঞ্জ করতে হবে। আমাদেরকে অলটারনেটিভ সিস্টেম খুঁজে বের করতে হবে। আমাদেরকে দূরশিখন ব্যবস্থা রিভিউ করতে হবে’’।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের

সাক্ষরতায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সাক্ষরতা দিবসে মিছিল নিয়ে এলাকা প্রদক্ষিণ

উপলব্ধিতে রয়েছে পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যতো মহামারী হয়েছে তার সবগুলোই মানুষ উতরেছে তার জ্ঞান এবং শিক্ষার প্রয়োগের মাধ্যমে। সময় এসেছে নিরক্ষরতাকে উতরাবার। আমাদেরকে নিত্য নতুন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে হবে। দূরশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি। আমাদেরকে এখন চিন্তা করতে হবে কীভাবে এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া যায়। দূরশিখনে ব্যবহৃত ডিভাইসগুলোকে আমাদের আপডেট করতে হবে। এখনো আমাদের দেশের অনেকে জানেননা কীভাবে প্রযুক্তি নির্ভর যন্ত্রগুলো ব্যবহার করতে হয়। যারা গ্রামে বাস করেন এবং বয়সে একটু প্রবীণ তারা এখনো প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেননা। নীতিনির্ধারকদের এর সহজ পন্থা বের করতে হবে। এ জায়গাটিতে অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে এডুকেশন সেক্টরের। যেই কারণে দূরশিখন কার্যক্রম পরিচালনা ও সহজতর করতে উন্নত ডিভাইস সরবরাহের ব্যবস্থা হাতে নিয়েছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টর।

উপসংহার কোভিড -১৯ সঙ্কটের প্রভাবে আজকে অনেক শিক্ষক বেকার হয়ে পড়েছেন। যদিও অনেক এনজিও নিজস্ব ও তহবিল থেকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক শিক্ষককে এখনো টিকিয়ে রেখেছেন এবং সরকার সরকারি স্কুল শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন প্রদান করছেন। কিন্তু প্রাইভেট স্কুলগুলোর শিক্ষকরা আছেন করুণ অবস্থায় আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে এসব জানছি, দেখছি। পথশিশুদের জন্যে দিতে পারিনি যথাযথ নিরাপদ বাসস্থান। তারা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। সরকার তথা দাতা সংস্থাগুলোর এখনি এগিয়ে আসার সময় । শিক্ষাব্যবস্থা যথাযথভাবে চলমান রাখতে হলে, নিরাপদ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে অর্থের যোগান দিতে হবে। শিক্ষাবিদদের এগিয়ে আসতে হবে নতুন নতুন উদ্ভাবন নিয়ে। শিখন-শিক্ষণ কৌশলে পরিবর্তন আনতে হবে। যাতে সুবিধা বঞ্চিতসহ সকল শিশু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। প্রি-প্রাইমারি থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সকলেই যাতে নিরাপদ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেই ব্যবস্থাটা জোরদার করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বৈষম্য দূর করতে হবে। আমাদেরকে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একত্রে কাজ করা জরুরি। এ কাজগুলো করতে যেসকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে দ্রুততার সাথে তার সমাধান করে একটি সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়কের ভূমিকা পালন অব্যাহত রেখেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

মো. রিজওয়ান আলম, *প্রোগ্রাম অফিসার, রিপোর্টিং, ডকুমেন্টশন এন্ড কমিউনিকেশন, কাপ-ইউইউপি প্রকল্প, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন*

আলোর পথযাত্রী খাদেম আনছারউদ্দীন আহমদ

ইকবাল মাসুদ

খাদেম আনসারউদ্দীন আহমদ ছিলেন আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর অদম্য আত্মার প্রতিচ্ছবি। খাদেম আনসারউদ্দীন আহমদ শৈশবে যে মহারুহের পদপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তা তিনি পূর্ণতা এনেছিলেন মুর্শিদের আদর্শকে ধারণ করে। তিনি মুর্শিদের স্বপ্নকে লালন করেছেন গভীর মমতায় ও সাহসী লড়াইয়ে। তাসাউফ বা আধ্যাত্মিকতা অর্থাৎ স্রষ্টার নৈকট্য লাভ ও বিশ্বমানবতার যে জাগতিক দিক নিয়ে পর্ণাঙ্গ হয়েছে ইসলাম। আর সেই আধ্যাত্মিকতা ও বিশ্বমানবতার সমন্বিত রূপের আদর্শকে ধারণ করেই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের এগিয়ে চলা। প্রবলভাবে আল্লাহের নৈকট্য লাভের আকাঙ্খা ও স্রষ্টার সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই হল প্রাথমিকভাবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) দর্শনের মূল ভিত্তি। তাই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.), খাদেম আনসারউদ্দীন আহমদ ও আহ্ছানিয়া মিশনকে বুঝতে গেলে আধ্যাত্মিকতা ও জাগতিকতার সমন্বিত রূপকে বুঝতে হয়। আমরা খাদেম আনসারউদ্দীন আহমদের জীবন ও কর্মকে যেভাবে পার্যালোচনা করি না কেন তার মাঝে এই সমন্বিত রূপকে খুঁজে পাই।

গত ৭ জুলাই ২০২০ খাদেম আনসারউদ্দীন আহমদ ৮৫ বছর বয়সে জাগতিকতার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে আধ্যাত্মিকতার পথে আল্লাহ ও মুর্শিদের সাথে মহামিলনের উদ্দেশ্যে আলোর পথযাত্রী হয়েছেন। সাতক্ষীরার নলতা গ্রামের হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-র দরবার শরীফের অতন্দ্র প্রহরী খাদেম আনসারউদ্দীন আহমদ ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিলেন সকলের ‘‘খাদেম সাহেব”। খাদেম শব্দের আরবি অর্থ দাস, ভৃত্য। তবে শব্দ আর অর্থ যাই হোক না কেন, তিনি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-র দেখানো পথে, মানুষকে খেদমত করে খাদেম হতে

খাদেম আনছারউদ্দীন আহমদ

চেয়েছেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-বিভিন্ন লেখনিতে দেখেছি তিনি স্রষ্টার সৃষ্টির খেদমত করেই আনন্দলাভ করতে চেয়েছেন ও খাদেম হিসেবে নিজেকে মানবতার সেবায় উজাড় করে দিয়েছেন। ঠিক তেমনিভাবে খাদেম আনসারউদ্দিন আহমদ তার মুর্শিদের আদর্শের অনুসারি হিসেবে স্রষ্টার ইবাদত ও সৃষ্টের সেবা করেই সবার প্রিয় ‘খাদেম সাহেব’ হয়েছেন। তবে খাদেম আনসারউদ্দীন আহমদ থেকে খাদেম সাহেব হয়ে উঠার পথ খুব সহজ ছিলনা, অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন আদর্শ অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব, সবার শ্রদ্ধেয় ‘খাদেম সাহেব’। একজন মুসলিমের জীবনে সবচেয়ে বড় অর্জন হল ইসলামের খেদমত করতে পারা, আর তা খাদেম আনছারউদ্দীন আহমদ পেরেছেন।

যদি কোনো মানুষের হৃদয় আলোকিত না হয় তাহলে তাঁর কর্ম কখনো আলোকিত হবে না, এটাই শাশ্বত নিয়ম। খাদেম আনছারউদ্দীন আহমদ-এর কর্মের মধ্যেই তার মননশীলতা আর আলোকিত হৃদয়ের আলোক ছটার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাঁর ব্যক্তিজীবন, কর্মজীবন ও আধ্যাত্মিকজীবন এই তিন দিক পর্যালোচনায় তার জীবনের চিত্র পুরোপুরি না আসলেও কিছুটা অনুধাবন করা যায়।

আমরা যদি তার ব্যক্তি জীবনের দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে দেখব, তিনি পূতপবিত্র ও স্বচ্ছ

জীবন-যাপন করতেন। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস পরিহার করে সরল সোজা ও সাদামাটা জীবন-যাপন ছিল তাঁর। সর্বোপরি অবিবাহিত জীবন, পোশাক বলতে দুই খন্ড সাদা কাপড়, পাদুকাবিহীন চলাচল, নাম মাত্র আহার, আদ্যন্ত নম্রকণ্ঠ, রোজাব্রত পালন করেছেন জীবনভর, আর সংসার বলতে রওজা শরীফের আর শাহীবাগের ছোট্ট একটা ঘর। জাকজমকহীন জীবনে মুর্শিদের অনুসরণে অতিথিপরায়ণতা সর্বজনবিদিত। আতিথেয়তার বিষয়ে তিনি কখনো সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা আমলে নেননি। পরিশ্রমী আর সময়ানুবর্তিতার মধ্য দিয়েই গড়ে তুলেছিলেন তার আপন ভূবন। তাঁর ছিল ব্যক্তিগত সকল চাওয়া পাওয়ার ঊর্ধ্বে একটি কল্যাণময় শুভ্র জীবন।

প্রতিচ্ছবি ছিলেন। বংশগত দিক থেকে তিনি যেমনি ছিলেন আশরাফ, তাঁর কর্মজীবনও ছিল তেমনি বর্ণাঢ্য।

কর্মজীবন শেষে যখন স্বমহিমায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন করেন, সময়টা তখন ১৯৩০ সাল, খাদেম আনছারউদ্দীন আহমদের পিতা চৌধুরী এজাহার হোসেন সাহেব খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-র আদর্শের অনুরাগী ও ভক্ত হওয়ায় তাঁর বাসায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-র উপস্থিতিতে মাঝে মধ্যে মিলাদের আয়োজন হতো। তখন খাদেম আনছারউদ্দীন আহমদ তার মুর্শিদকে সেবা করার সুযোগ পেতেন। সেই থেকে খাদেম আনছারউদ্দীন আহমদ তার সান্নিধ্যে পবিত্রতা

আমরা যদি তার ব্যক্তি জীবনের দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে দেখব, তিনি পূতপবিত্র ও স্বচ্ছ জীবন যাপন করতেন। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস পরিহার করে সরল সোজা ও সাদামাটা জীবন যাপন ছিল তাঁর। সর্বোপরি অবিবাহিত জীবন, পোশাক বলতে দুই খন্ড সাদা কাপড়, পাদুকাবিহীন চলাচল, নাম মাত্র আহার, আদ্যন্ত নম্রকণ্ঠ, রোজাব্রত পালন করেছেন জীবনভর, আর সংসার বলতে রওজা শরীফের আর শাহীবাগের ছোট্ট একটা ঘর।

ব্যক্তিগত পরিচয়ে তিনি ১৯৩৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি নলতা শরীফের অদূরে পাইকাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করা পিতা চৌধুরী মো: এজাহার হোসেন ও মাতা জোহরাতুন্নেছার বড় সন্তান। পরিবারটি অভিজাত ও বিত্তশালী ছিল বলেই জীবন ধারণের কমতির কিছু ছিল না। তবে জীবনের প্রথম ধাক্কাটি আসে খুব অল্প বয়সে মাকে হারিয়ে। সেই আঘাত কাটিয়ে অত্যন্ত মেধার সাথে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় তিনি অংকে বেশ পাকা ছিলেন, পেতেন এক'শোয় এক'শো। শৈশব কাটিয়ে কৈশোরে পা রেখেই তিনি তাঁর বহুমুখী কর্ম পারদর্শিতার কথা জানান দেন, সাথে যোগ হয় সুফি-সঙ্গীত আর ভক্তি-গজলের ভালোবাসা। এককথায় বলা যায় খাদেম আনছারউদ্দীন আহমদ সত্যিকারার্থেই একজন কর্মবীর মহাপুরুষের

আর ভালোবাসায় সিক্ত হতেন। এভাবেই একসময় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) তাঁর বাবার কাছে তরুণ খাদেম আনছারউদ্দীন আহমদকে চাইলেন। আর তাঁর বাবা সেই প্রস্তাব লুফে নিয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-র খিদমতের জন্য তাকে কবুল করে দিলেন। সেদিন থেকে যুবক আনসারউদ্দীন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-র খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন এবং সময়টি তখন ষাটের দশক, আর আনছারউদ্দীন আহমদ এর খাদেম সাহেব হওয়ার গল্প এখান থেকেই আস্তে আস্তে শুরু। এরপরে খাদেম সাহেবকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি, সমাজ-সংসার ছেড়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-র জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটানা খিদমত করার সুযোগ পান খাদেম আনছারউদ্দীন আহমদ।

খাদেম আনছারউদ্দীন আহমদকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) কতটুকু ভালোবাসতেন তা তাঁর পত্রসমূহ পর্যালোচনা করলে যৎসামান্য কিছু প্রমাণ পাওয় যায়। ১৯৬০ সালে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) লিখিত একটা পত্রে এর কিছু অংশ প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন 'দু'নয়নের জ্যোতি কবি আমার, তোমার কবিত্ব আমার শক্ত অন্তরকে একদম বিগলিত করে দেয়। ঐ হাসি মুখখানি শয়নে স্বপনে মনে পড়ে। কত ইচ্ছা হয় দুই লোকমা বাবার মুখে তুলে দিই, আর ধন্য হই। তুমি বালক হয়ে এতাধিক মহব্বত এই গরীবের জন্য পোষণ কর, সেজন্য আমি কত গর্বিত। ইচ্ছা হয় বুকখানি বিছিয়ে দিই তোমার জন্য। কিন্তু নিষ্ঠুর তুমি, কখনো কোল দিতে চাও না।' এযেন মাওলানা জালালুদ্দীন রুমি ও তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু শামস্-ই তাবরিজের ভালোবাসার ও অভিব্যক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রুমির কবিতায় শামসের কথা বারবার এসেছে এবং তাদের ভালোবাসার সম্পর্কের ধরণ প্রায় প্রত্যেককেই বিস্মিত করে। ঠিক তেমনি খাদেম আনছারউদ্দীন আহমদের আত্মউৎসর্গ কতটা ভক্তি ও অনুরাগে সিক্ত তা সহজেই অনুমানযোগ্য। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ও খাদেম আনছারউদ্দীন আহমদের ভালোবাসার তুলনা ও দু'জনের সম্পর্ক কতটা নিবিড় তা শুধু শামসের জন্য রুমির ভালোবাসার সাথেই তুলনিয়।

অনেকে মনে করেন মাওলানা রুমির আধ্যাত্মিক গুরু শামস্-ই তাবরিজ এমন একজন ব্যক্তি যিনি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন, যিনি পূর্ণ উপলব্ধি অর্জন করেছিলেন। যখন কেউ উপলব্ধি অর্জন করে সাধনার উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত হয় তখন তিনি সকল প্রকার পার্থিব যোগাযোগের অতীত হয়ে যান, সকল ভাষা, সকল ধারণা, সকল ভাব তাঁদের বহু নিম্নে অবস্থান করে এবং সেই অবস্থায় তাঁদের যা প্রয়োজন হয় তা হলো একজন যোগ্য মুখপাত্র। শামস্-ই-তাবরিজ-এর ক্ষেত্রে মাওলানা রুমি ছিলেন তার সেই কাঙ্খিত মুখপাত্র, আর খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-র ক্ষেত্রে খাদেম আনছারউদ্দীন আহমদ ছিলেন তার যোগ্য মুখপাত্র।

এখন খাদেম সাহেবের ব্যক্তি জীবনের বাইরে তাঁর কর্মময় জীবনের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে চাই। যারা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) -কে বুঝেন তারা একটা জায়গায় সবাই একমত যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা আধ্যাত্মিকতা ও

জাগতিকতার বিষয়ে সমন্বয় ঘটিয়ে ছিলেন। আর এই বিষয়টির জন্য অন্যান্য পীর, সুফি ও মুরর্শিদ থেকে তাঁর ব্যবধান রচনা করে দিয়েছে। ঠিক তেমনি খাদেম সাহেব আধ্যাত্মিকতা ও জাগতিকতার সমন্বিত পথকে অনুসরণ করে, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ভাবনা ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। সীমিত পরিসরেও যদি আমরা উল্লেখ করি তাহলে আমরা দেখব ১৯৬৫ সালে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-র ইন্তেকালের পরে পাকরওজা শরীফ নির্মাণের কাজটি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করেছেন খাদেম সাহেব। পাশাপাশি রওজা শরীফের চারপাশকে সুপরিকল্পিত স্থান হিসেবে গড়ে তুলেছেন। যার কল্যাণে হাজার ভক্তের আবেগ অনুভূতিতে তা স্থান করে নিয়েছে। তাঁর এ মানবপ্রেম ও জনকল্যাণের আরও কিছু নিদর্শন হচ্ছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ। যেসব সৃষ্টি তার জীবনকে মানুষের মনের মনিকোঠায় স্থান করে দিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম, নলতার প্রি-ক্যাডেট স্কুল স্থাপন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা প্রি-ক্যাডেট এন্ড হাইস্কুল প্রতিষ্ঠায় জমিদান, নলতা আহ্ছানিয়া মিশন রেসিডেন্সিয়াল কলেজের প্রতিষ্ঠা, ঢাকার উত্তরায় নলতা শরীফ আহ্ছানিয়া মিশন এতিমখানা প্রতিষ্ঠা, আহ্ছানিয়া মিশন চক্ষু এন্ড জেনারেল হাসপাতাল-এর প্রতিষ্ঠা এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইন্সটিটিউট-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন। নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের মাধ্যমে 'আহ্ছানিয়া মিশন শিক্ষা পরিষদ' গঠন করে নলতা শরীফ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার অসংখ্য শিক্ষার্থীর বৃত্তির ব্যবস্থা করেন খাদেম সাহেব।

নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে খাদেম আনছারউদ্দীন আহমদের ভাবনা ও তা বাস্তবায়নে তার সহযোগিতা মিশনকে সম্প্রসারিত করেছে। আজকে নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের যে কর্ম বিস্তৃত হয়েছে তার অন্যমত রূপকার ছিলেন তিনি। কেন্দ্রীয় মিশনে যত ঝড়-ঝাপটা এসেছে তাঁর ছোঁয়াতেই সেসবের উত্তরণ ঘটেছে। মানব কল্যাণে যে সম্পদের প্রয়োজন হয় তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের যোগান দেওয়ার উদ্যোগ তিনিই নিতেন। আর এ পথ যে মসৃণ ছিল, তা নয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মিশনগুলোকে সক্রিয় করতে তাঁর ভূমিকা স্মরণযোগ্য। তিনি দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে গেছেন ভক্তকুলের মনের ব্যাকুলতা নিরসনে।

আধ্যত্মিক জীবনে তিনি যতদিন সুস্থ ছিলেন নামাজ পড়েছেন, সারাবছর রোজা পালন করেছেন, প্রতিনিয়ত মানুষের জন্য দোয়া, তাবিজ প্রদান, বৃহত্তম ইফতার আয়োজন করে রোজাদারের মুখে ইফতার তুলে দিয়েছেন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান, ইতেকাফ আয়োজনে সহযোগিতা, মৃত মানুষের জানাযায় অংশগ্রহণ, তাঁর মুর্শিদের অনুশ্রীত পথে বিভিন্ন ধর্মীয় দিবস পালন, মিলাদের আয়োজন করেছেন। প্রতিবছর ওরশ শরীফ আয়োজনে তাঁর ভূমিকার কথা অকপটে সকলে স্বীকার করেন, তিনি তিনবার ভক্ত অনুরাগীসহ পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেছেন। এছাড়া নলতা দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসা, নলতা হাফিজিয়া মাদ্রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠায় তার অবদান স্মরণযোগ্য। তার কর্মই তাকে সবচেয়ে সম্মানিত বা মহিমান্বিত অর্থাৎ আশরাফ করেছে। কবি আবুল হাশেমের কথায় "নহে আশরাফ যার আছে শুধু বংশের পরিচয়, সেই আশরাফ জীবন যাহার পূণ্য কর্মময়" তাই আমরা বলতে পারি খাদেম আনছারউদ্দীন আহমদ আশরাফ হয়েছেন তার কর্মময় জীবনের জন্য।

খাদেম আনছারউদ্দীন আহমদ পূর্ণ শরিয়তের নির্দেশনা পালনের পাশাপাশি তাসাউফচর্চা করেছেন। তারা বিনম্রতা, অহিংসা, নিরহংকার, অকৃত্রিমতা, প্রেমবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.)-র আদর্শের প্রসার ঘটিয়েছেন। নৈতিকতার বর্তমান চরম অবক্ষয়ের যুগে বিশ্বমানবতাকে পুনরায় নৈতিকতায় ফিরিয়ে আনতে তিনি প্রকৃত সুফিবাদচর্চা উৎসাহিত করেছেন। মানুষকে খাঁটি মানুষ, পরিপূর্ণ মানুষ আর সমাজ-সভ্যতা ও মানবতার জন্য উপযোগী নিয়ামক শক্তিসম্পন্ন সত্যিকারের মানুষে পরিণত করার চেষ্টা করেছেন। এভাবেই তিনি মুর্শিদের আদর্শকে অধিক স্থায়ী ও টেকসই করেছেন।

প্রকৃত অর্থে কর্মজীবন থেকে তিনি কখনো অবসর গ্রহণ করেননি। পুরো জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তিনি একের পর এক কর্ম সম্পাদন করেছেন এবং সবখানেই তিনি আশাতীত সফলতা লাভ করেছেন। তিনি একজন অসাধারণ মানবপ্রেমিক মানুষ ছিলেন। তার ছায়াতলে অসংখ্য মানুষ উপকৃত হয়েছে। মুর্শিদের দেখানো পথে তিনি যে প্রেমদর্শন লাভ করেছেন তা ছিল ইমানের জ্যোতি, সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি পবিত্র প্রেম, কুরআনের বাণীর ওপর অটল বিশ্বাস, সত্যিকার পীর, মুর্শিদ, আউলিয়া ও বুজুর্গদের প্রতি অগাধ ভক্তি এবং সর্বোপরি মানবপ্রীতি। নর-নারী, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে তিনি তার ভালোবাসার বাঁধনে আবদ্ধ করতেন। তাঁর প্রতিটি অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থাকতো উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অন্যান্য ধর্মের মানুষ এবং ভিন্ন মত ও পথের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ। খাদেম সাহেব নিজেকে খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.)-এর মাঝে বিলীন করেছিলেন এবং তাকে ভক্তি প্রদর্শনের প্রকাশ্য ও অন্তর্নিহিত বস্তুতে পরিণত করেছেন। তার এই মানব প্রেম ছিল জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সর্বজনীন।

বিশ্বের খ্যাতিমান উর্দু কবি মুহাম্মদ ইকবালের মতে, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত পুরুষ বা মর্দে মুমিন, যিনি জীবনযুদ্ধে কেবল তিনটি জিনিসকে তার তলোয়ার বা হাতিয়ার বানিয়ে নেন। সে তিনটি মহামূল্যবান অস্ত্র হচ্ছে —সুদৃঢ় ইমান, অনবরত কর্মতৎপরতা এবং ভূবনজয়ী ভালবাসা তথা সর্বজনীন প্রেম। এ সংজ্ঞার আলোকে খাদেম আনছারউদ্দীন আহমদ সত্যিকারার্থেই এমন একজন ইনসানে কামেল বা মর্দে মুমিন, যাঁর জীবনে আমরা ওই তিনটি গুণেরই বিরল সমাবেশ প্রত্যক্ষ করেছি।

সফলতা বলতে অধিকাংশ মানুষই কেবলমাত্র বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানই বুঝে থাকে বা নিত্যদিনের কর্মকেই বুঝেন। কিন্তু আমরা দেখেছি খাদেম আনছারউদ্দীন আহমদ বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত কর্মের মালা গেঁথেছেন এবং সফলতার সাথে তার উপর গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গত ৭ জুলাই ২০২০ খাদেম আনসারউদ্দীন আহমেদ স্রষ্টার কাছে ফিরে গেছেন। এ যাত্রা তো পরমাত্মার সাথে আত্মার মিলনের,তাঁর চলে যাওয়া মানে মহামিলনের পথে আলোর পথযাত্রী হওয়া।

ইকবাল মাসুদ *পরিচালক, স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টর*
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সূত্র:
১. *দিওয়ান ই শামস ইতাবরিজ*
২. *নলতা কেন্দ্রীয় আহছানিয়া মিশন ওয়েব সাইট*
৩. *মৌলভী আনছারউদ্দীন আহমদ: সততায়, পবিত্রতায় আর প্রেমিকতায় উদ্ভাসিত এক জীবন, মো: মনিরুল ইসলাম, পরিচালক, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউট*

৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবসে মিশনের সেমিনার

আগামী দিনের অনলাইন শিখন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও অভিভাবকের প্রস্তুতি

নাফিজ উদ্দিন খান

সভ্যতার অগ্রগতিতে শিক্ষার যেমন কোন বিকল্প নেই তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি শিক্ষকেরও কোন বিকল্প নেই। একথা দিবালোকের মতই পরিষ্কার যে, শিক্ষকের মেধা, দক্ষতা সর্বপরি নিষ্ঠার উপরই নির্ভর করে শিক্ষার গুণগত মান। আজকের দিনে গুণগত শিক্ষার জন্য চাই যোগ্য, দক্ষ, মেধাবী আদর্শ শিক্ষক। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন। শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা করে শিক্ষার্থীদের মনে দাগ কাটা যায় না। এটি করা দরকার শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া আর শিখন কার্যক্রমের মাধ্যমে। শ্রেণিকক্ষে আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষাদান করলে তা শিক্ষার্থীদের মনে স্থান করে নেবেই। আর এভাবেই স্থায়ী শিক্ষণ ঘটে। তবে শিক্ষণ-শিখনের এইসব বিষয়গুলোর ওপর শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে শিক্ষকরা তা শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগে সচেষ্ট হবেন।

আজকের দিনে গুণগত শিক্ষার জন্য চাই যোগ্য, দক্ষ, মেধাবী আদর্শ শিক্ষক। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন। শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা করে শিক্ষার্থীদের মনে দাগ কাটা যায় না। এটি করা দরকার শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া আর শিখন কার্যক্রমের মাধ্যমে।

সকল ধরণের উন্নয়নের চালিকা শক্তি হল মানসম্মত শিক্ষক। বৈশ্বিক উন্নয়নে শিক্ষকের গুরুত্বের কারণে ইউনেস্কো ১৯৯৪ সালে ৫ অক্টোবরকে বিশ্ব শিক্ষক দিবস ঘোষণা করে। সেই থেকে সারা বিশ্বে শিক্ষক দিবস পালিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর বিশ্ব শিক্ষক দিবস একটি শ্লোগানকে সামনে রেখে পালিত হয়। বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২০-এর শ্লোগান হলো "শিক্ষক: সংকটে নেতৃত্বদাতা, ভবিষ্যতের রূপদর্শী" (Teachers: Leading in the Crisis, reimagining the future)।

২০২০ সালে কোভিড-১৯ মহামারি সারা বিশ্বের জীবন ব্যবস্থাকে পাল্টে দিয়েছে। থমকে গেছে শিক্ষা পরিস্থিতি। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যাবস্থাতেও এর প্রভাব পড়েছে। অনলাইন শিখনের মাধ্যমে কোনো রকমে শিক্ষা পরিস্থিতিকে কিছুটা হলেও চালু রাখা হয়েছে। এই বিষয়টিকে সামনে রেখে প্রতি বছরের মত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবারও বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালন করেছে। ৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন "আগামী দিনের অনলাইন শিখন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রস্তুতি" শীর্ষক এক অনলাইন সেমিনারের আয়োজন করে। মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমানের সঞ্চালনায় এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মূল বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাস, আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের শিক্ষক লালন সূত্রধর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটের সদ্য সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. তাহমিনা আখতারের বক্তব্য দেওয়ার কথা থাকলেও ইন্টারনেট সমস্যার কারণে তা সম্ভব হয়নি।

এসডিজি লক্ষ্য-৪ মানসম্মত শিক্ষণ-শিখনের জন্য যোগ্য শিক্ষক নিশ্চিতকরণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। এসকল প্রেক্ষাপটে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে আইসিটি ব্যবহারে বাংলাদেশের শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটি বা তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়টি মানসম্মত ও যুগপোযোগী শিক্ষার জন্য অত্যাবশকীয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও চাহিদার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক পরিবর্তন ও প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের ফলে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ-শিখনেও পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এইসব পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও আইসিটি নির্ভর শিক্ষণ-শিখনের সাথে শিক্ষকদের অভিযোজনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিগত কয়েক দশক ধরে সবার জন্য শিক্ষা অর্জনে অনেক ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তবে ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে সম্প্রতি ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের বিষয়টি খুবই গুরুর্ত্ব পেয়েছে। এসডিজি লক্ষ্য-৪ মানসম্মত শিক্ষণ-শিখনের জন্য যোগ্য শিক্ষক নিশ্চিতকরণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। এসকল প্রেক্ষাপটে সবার

জন্য মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে আইসিটি ব্যবহারে বাংলাদেশের শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকতা একটি মহান পেশা। এ পেশায় দায়িত্বশীলতা অনেক বেশি। এটি এমন এক পেশা যা গতানুগতিক নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকে না। শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীদের আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়তা করা। এটি তিনি কীভাবে করবেন তা তিনিই জানেন। এইক্ষেত্রে শিক্ষকের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা দরকার। শিক্ষক শিখণ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে স্বপ্নের বীজ বোনেন। এই কাজটি সাধারণ কাজ নয়। শিক্ষক স্বাধীনভাবে এই কাজ করতে পারলে ক্রমান্বয়ে তিনি ক্ষমতায়িত হন। তার ইচ্ছাশক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এই জন্যই শিক্ষককে হতে হয় যোগ্য, দক্ষ আর মেধাবী।

তথ্য প্রযুক্তির ক্রমাগত বিকাশ আগামী দিনগুলোতে ফেইস-টু-ফেইস অন-ক্যাম্পাস শিখনের পাশাপাশি অনলাইন শিখনেরও ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে এর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে। অনলাইন শিখন ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিখন পরিবেশ, ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ, তথ্য প্রযুক্তি উপকরণ, মূল্যায়ন, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির সুবিধা থাকা দরকার।

ভাল শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে রোল মডেল। ক্লাসরুমে শিক্ষকের ভূমিকা তাকে রোল মডেলের মর্যাদায় বসায়। শিক্ষার্থীরা ভাল শিক্ষককে সর্বোতভাবে অনুসরণ করে। আর ক্লাসরুমে শিক্ষকের ভাল ভূমিকা শিক্ষার্থীর আচরণে পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে। কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন। এই আচরণিক পরিবর্তনের মধ্যমে শিক্ষার্থীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। এভাবেই তৈরি হয় সুনাগরিক। এরকম সুনাগরিক তৈরি হলেই তারা পরবর্তীকালে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। শিক্ষা একটি সামগ্রীক কার্যক্রম। শিক্ষা শুধুমাত্র বিদ্যালয়েই অর্জিত হয় না, শিক্ষা অর্জিত হয় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। তবে শিক্ষার মূল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকেন শিক্ষক। শিক্ষক যেভাবে শিক্ষণ-শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন, শিক্ষার্থীদের আচরণ সেভাবেই পরিবর্তিত হবে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের পারস্পরিক ও ইতিবাচক সম্পর্ক শিক্ষার্থীর আচরণিক পরিবর্তনের মূল শক্তি। অনলাইন শিখনে শিক্ষক যদি তার শিক্ষার্থীর মনে ইতিবাচক চেতনা সৃষ্টি করতে পারেন এবং অভিভাবক যদি তা সমর্থন করেন তাহলে সেটিই হবে প্রকৃত শিক্ষা। কারণ, অনলাইনে শিখনকে আকর্ষণীয় করে তোলার প্রধান ভূমিকা পালন করবেন একজন শিক্ষক।

তবে এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন। শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা করে শিক্ষার্থীদের মনে বৈষম্যহীনতার বীজ বুনা যায় না। এটি করা দরকার শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া আর শিখন কার্যক্রমের মাধ্যমে। সম্ভাব্য যেসব কর্যক্রম শিক্ষার্থীর মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ছাত্র-ছাত্রী উভয়কে সমানভাবে শ্রেণির কর্মে সম্পৃক্ত করা, উপস্থাপনায় সমান সুযোগ দিয়ে ক্ষমতায়ন বিচার করা, সমভাবে নেতৃত্বের সুযোগ সৃষ্টি করা, তথ্য প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যবহারে সমান সুযোগ ইত্যাদি। এভাবে সুযোগ সৃষ্টি করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক ও নারী-পুরুষ বৈষম্যের বিষয়টি ক্রমান্বয়ে দূরীভুত হয়। তবে শিক্ষণ-শিখনের এইসব বিষয়গুলোর ওপর শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে শিক্ষকরা তা শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগে সচেষ্ট হন।

অনলাইন শিখনে অভিভাবকদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের অনলাইন শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত উপস্থিতি, যথাযথ প্রযুক্তি সরবরাহ ও ব্যবহারের প্রশিক্ষণ, নোট-গাইড পড়া থেকে শিক্ষার্থীদের বিরত রাখা, শিক্ষার্থীর অগ্রগতির খোঁজ রাখা, প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া অভিভাবকদের দায়িত্ব।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও চাহিদার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক পরিবর্তন ও প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের ফলে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ-শিখনেও পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এইসব পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও আইসিটি নির্ভর শিক্ষণ-শিখনের সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রস্তুতি ও অভিযোজনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিগত কয়েক দশক ধরে সবার জন্য শিক্ষা অর্জনে অনেক ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তবে ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে সম্প্রতি ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের বিষয়টি খুবই গুরুর্ত্ব পেয়েছে। এসডিজি লক্ষ্য-৪ মানসম্মত শিক্ষণ-শিখনের জন্য যোগ্য শিক্ষক নিশ্চিতকরণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।

নাফিজ উদ্দিন খান, কো-অর্ডিনেটর, বাংলাদেশ লিটারেসি এ্যাসোসিয়েশন

শিক্ষক শিখণ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে স্বপ্নের বীজ বোনেন। এই কাজটি সাধারণ কাজ নয়। শিক্ষক স্বাধীনভাবে এই কাজ করতে পারলে ক্রমান্বয়ে তিনি ক্ষমতায়িত হন। তার ইচ্ছাশক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এই জন্যই শিক্ষককে হতে হয় যোগ্য, দক্ষ আর মেধাবী।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন। এই আচরণিক পরিবর্তনের মধ্যমে শিক্ষার্থীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। এভাবেই তৈরি হয় সুনাগরিক। এরকম সুনাগরিক তৈরি হলেই তারা পরবর্তীকালে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

বন্যায় আক্রান্ত ক্ষুদ্র কৃষক ও দরিদ্র সদস্যদের মধ্যে জামালপুর সদর উপজেলার শরিফপুর ইউনিয়নে অবস্থিত শরিফপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়

দরিদ্র জনপদে অর্থনৈতিক উন্নয়নে মিশন

মো. আসাদুজ্জামান

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেক্টর দারিদ্র বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি, ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করে। এ ছাড়াও ভোক্তাদের অধিকার, পণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষে ছোট ছোট ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কৃষি ও অকৃষি উভয় খাতে উৎপাদনশীলতা এবং বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন সহযোগিতা করে। এ ছাড়াও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিসেবাগুলোর নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক উপার্জন এবং বিদেশে দক্ষতাভিত্তিক কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশ গমনেও সহায়তা করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়নাধীণ প্রকল্প সমূহের জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ সময়ে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম এখানে উল্লেখ করা হল।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন Read Foundation-এর আর্থিক সহযোগিতায় DAM UK-এর মাধ্যমে "Zakat for Flood Affected Farmers,Jamalpur Project,Bangladesh" প্রকল্পটি জামালপুর জেলার সদর উপজেলায় কেন্দুয়া ও শরিফপুর ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সামগ্রী সহায়তা এবং বন্যা পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ আগষ্ট ২০২০ তারিখ হতে ৩১ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের প্রতি ইউনিয়নে ২ জন করে মোট ৪ জন কমিউনিটি ভলান্টিয়ার নিয়োগ দিয়ে তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। প্রকল্পের কর্মএলাকা কেন্দুয়া ও শরিফপুর ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫২৮ জন ক্ষুদ্র কৃষক ও দরিদ্র উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। এদের মধ্যে রয়েছেন কেন্দুয়া ইউনিয়নে ৩১১ জন এবং শরিফপুর ইউনিয়নে ২১৭ জন।

প্রকল্পটির ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ৩১১ জন বন্যায় আক্রান্ত ক্ষুদ্র কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে জামালপুর সদর উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়নে অবস্থিত বাংলাদেশ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এবং ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ২১৭ জন বন্যায় আক্রান্ত ক্ষুদ্র কৃষক ও দরিদ্র সদস্যদের মধ্যে জামালপুর সদর উপজেলার শরিফপুর ইউনিয়নে অবস্থিত শরিফপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল, ডাল তেল, চিনি, পিয়াজ, রসুন, লবণ, আলু ও মসলা (মরিচ, হলুদ, ধনিয়া গুড়া) এবং স্বাস্থ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল গোসলের সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার, ওরস্যালাইন, মেট্রিল, প্যারাসিটামল এবং মাস্ক। পরবর্তীতে এ

প্রকল্পের মাধ্যমে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বন্যা পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে ইনপুট সাপোর্ট (বিভিন্ন সবজি বীজ) ও আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে।

করোনা মোকাবেলায় সৌহার্দ্য III কর্মসূচি

USAID ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় এবং কেয়ার বাংলাদেশের কারিগরী সহায়তায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর ও দোয়ারাবাজার উপজেলা এবং হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং ও আজমিরিগঞ্জ উপজেলার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৬ সাল থেকে সৌহার্দ্য III কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

সৌহার্দ্য III কর্মসূচি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো; কোভিড-১৯ এর পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ, এবং সাবান পানি দিয়ে ২০ সেকেন্ড হাত ধোয়া, বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরা, সামাজিক দুরত্ব মেনে চলা, জনসমাগমে না যাওয়া, বাড়ির জানালা, দরজা, আসবাবপত্র, নলকূপ ব্যবহার, জানালা ও দরজার নব ও হ্যান্ডেল নিয়মিত ব্লিচিং পাউডার দিয়ে স্প্রে করা ও পরিস্কার রাখা প্রসঙ্গে পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি। উপরোল্লিখিত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে চলতি কোয়ার্টারে (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০) সৌহার্দ্য III কর্মএলাকার ১৪৩৬৯ জন ব্যক্তিকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সচেতন করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

লিফলেট বিতরণ : কোভিড-১৯ সংক্রমণকালীন সময়ে এর সংক্রমণ রোধ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা আহছানিয়া মিশন সৌহার্দ্য III প্রোগ্রামের মাধ্যমে কর্মএলাকাভুক্ত ১৩৪টি গ্রামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সচেতনতামূলক সচিত্র পোস্টার ও লিফলেট বিতরণসহ বিভিন্ন জনবহুল স্থানে টাঙিয়ে দেয়। এতে করে কর্মএলাকার লোকজন পোস্টারগুলো দেখে এবং পড়ে কোভিড-১৯ বিষয়ে সচেতন হতে সক্ষম হন। পাশপাশি নিজেরা বিষয়গুলি জানতে পারেন এবং অন্যদেরকেও জানানোর সুযোগ তৈরি হয়।

মোবাইল ফোন সার্ভিস: কোভিড-১৯ কালীন সময়ে সরকারি নির্দেশে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া সকল প্রকার চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করা বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ঢাকা আহছানিয়া মিশন কর্মএলাকার কমিউনিটি পর্যায়ে কোভিড-১৯ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সাথে কোভিড-১৯ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে, যার ফলে লোকজন কোভিড-১৯ কি, কেন হয় এবং তা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে সক্ষম হন।

টেলিমেডিসিন সেবা: কোভিড-১৯ সংক্রমণকালীন সময়ে সরকারি নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সাধারণ লোকজনের নিয়মিত চলাচল স্থবির হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় যেকোনো জরুরি চিকিৎসাসেবা পাওয়া নিশ্চিত করতে ঢাকা আহছানিয়া মিশন সৌহার্দ্য III প্রোগ্রাম টেলিমেডিসিন সার্ভিসের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীসহ কমিউনিটির লোকজনদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কাজ শুরু করে এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের মোবাইল নাম্বার সরবরাহ করে। এর ফলে স্থানীয় জনগণ যেকোনো স্বাস্থ্য সহয়োগিতা পাওয়ার ক্ষেত্রে উপজেলা হাসপাতাল, পরিবার পরিকল্পনা অফিস, কমিউনিটি ক্লিনিকসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়।

হ্যান্ড ওয়াশিং পয়েন্ট স্থাপন: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। জনগণের মধ্যে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে চলতি কোয়ার্টারে তাহিরপুর ও দোয়ারাবাজার উপজেলার ৪টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হ্যান্ড ওয়াশিং পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে।

আর্থিক সহায়তা: করোনাকালীন সময়ে বেকার হয়ে যাওয়া তাহিরপুর ও আজমিরিগঞ্জ উপজেলার বিপদাপন্ন ২৩৫৩টি পরিবারকে চলতি কোয়ার্টারে (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০) সর্বমোট ১,৪১, ১৮০০০(এক কোটি একচল্লিশ লক্ষ আঠারো হাজার) টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

জনগনের মধ্যে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে চলতি কোয়ার্টারে তাহিরপুর ও দোয়ারাবাজার উপজেলার ৪টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হ্যান্ড ওয়াশিং পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে

উক্ত কার্যক্রম হাতে নেওয়ার ফলে কর্ম এলাকায় জনগণের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা একটি ইতিবাচক পরিবর্তন এবং এটা কোভিড-১৯ এর ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

Orphan Kind প্রকল্পের উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট বিতরণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের Penny Appeal এর অর্থায়নে Orphan Kind Project সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলায় চারটি

ইউনিয়নে (নওয়াপাড়া, দেবহাটা, কুলিয়া এবং পারুলিয়া) মোট ১০০ জন দুস্থ ও অসহায় এতিম বাচ্চাদের নিয়ে গত মার্চ-২০২০ থেকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তার মাধ্যমে দুস্থ ও অসহায় এতিম বাচ্চাদের জীবনের মান উন্নয়ন ঘটানো।

এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম হিসেবে-

প্রতিমাসে প্রতিটি পরিবারকে খাদ্যদ্রব্য যেমন- চাল, ডাল, সয়াবিন তেল, ডিম এবং কলা বিতরণ করা হয়। গত জুলাই মাসে ঈদ সামগ্রী যেমন- পোলাওর চাল, সেমাই, সয়াবিন তেল, চিনি, শার্ট, প্যান্ট এবং থ্রিপিছ এবং করোনাকালীন সময়ে প্রতিটি পরিবারে Hygiene Materials যেমন- সাবান, সাবান কেইজ, ব্লিচিং পাউডার, মগ, গুড়োসাবান, স্যান্ডেল এবং মাস্ক বিতরণ করা হয়। প্রতিটি বাচ্চাকে স্কুল উপকরণ হিসেবে কাগজ, কলম, আর্টপেপার, আর্ট পেনসিল বক্স, পেনসিল, রাবার এবং কাটার বিতরণ করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে ঘর মেরামতের জন্য দেওয়া হয় ১ হাজার ৫০০ টাকা। বিতরণ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত ছিলেন দেবহাটা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া আফরিন এবং সহকারী কমিশনার (ভুমি) মো. জহুরুল ইসলাম। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ ও ইউনিয়নভিত্তিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি(সিডিসি)-র সদস্যবৃন্দ।

ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া বেগম

প্রত্যেক প্রবীণকে দেওয়া হয় পাঁচশত টাকা

অসহায় ও অসচ্ছল প্রবীণদের মধ্যে বয়স্ক ভাতা বিতরণ

প্রবীণরা কর্মময় জীবনে নিজ নিজ পরিবার সমাজ ও দেশ গঠনে অত্যন্ত নিষ্ঠা,আন্তরিকতা ও উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে অধিকাংশ প্রবীণই সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে খুবই অবহেলিত। যার ফলে তাদের অনেকেরে মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সীমাহীন কষ্ট ও মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রবীণদের সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাই প্রবীণদের কল্যাণে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দী ইউনিয়নে সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগিতায় প্রবীণদের জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দি ইউনিয়নে ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে অসহায় ও অস্বচ্ছল প্রবীণদের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে পল্লীকর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর গাইড লাইনের নির্দেশনা অনুসারে সমৃদ্ধি কেন্দ্র, ইউনিট অফিস, সমৃদ্ধি শিক্ষা কেন্দ্র, ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রবীণদের বয়স্ক/পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হয়। গত জুলাই/২০২০ মাস হতে সেপ্টেম্বর/২০ মাস পর্যন্ত মোট ১০০ জন প্রবীণের মধ্যে প্রত্যেককে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা করে মোট ১৫০০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার বয়স্ক/ পরিপোষক ভাতা বিতরণ করা হয়। এ পর্যন্ত ৯,৯৩০০০/- (নয় লক্ষ তেরানব্বই হাজার) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত অর্থ প্রবীণরা তাদের নিজেদের হাত খরচ, ঔষধ ক্রয় ইত্যাদিতে ব্যয় করেন। এর ফলে প্রবীণদের হাত খরচের জন্য পরিবারের অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয় না। এতে কিছুটা হলেও তাদের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে ও জীবন মানের উন্নয়ন ঘটেছে।

মো. আসাদুজ্জামান, *হেড, ডাম ফাউন্ডেশন ফর একোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)*

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মানছে না গণপরিবহণ ও রেস্তোরাঁ মালিকরা

মো. মোখলেছুর রহমান

‘ক্রস সেকশ্যনাল’ পদ্ধতিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত এক জরিপের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে রাজধানীর শতভাগ পাবলিক পরিবহণে (বাসে) এবং ৯৮ শতাংশ রেস্তোরাঁয় লঙ্ঘন হচ্ছে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন

আইনের সঠিক ও যথাযথ বাস্তবায়ন নেই

তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ব্যাপকতা ও ক্ষতির ভয়াবহতা বিভিন্নমূখি। গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস) ২০১৭ এর তথ্য মতে এ দেশে প্রায় ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ মানুষ তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার ও ধূমপান করে যার মধ্যে ১ কোটি ৯২ লক্ষ মানুষ ধূমপান করে। এই ধূমপানের ফলে বিভিন্ন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহণে পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতির শিকার হচ্ছে বহু মানুষ। টোব্যাকো এটলাস পরিসংখ্যানে দেখা যায় প্রতিবছর বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৬০ হাজারেরও অধিক মানুষের মৃত্যু হয় তামাক ব্যবহারজনিত কারণে। যা আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটি বিরাট হুমকি। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের ভয়াবহতা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে এবং ২০১৩ সালে উক্ত আইনের বিভিন্ন দুর্বল দিক বিবেচনায় নিয়ে তা সংশোধন করে। এছাড়া গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত “সাউথ এশিয়ান স্পীকার্স সামিট” -এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন আগামি ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ধূমপানমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবেন। তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ঢাকা শহরের পাবলিক পরিবহণে (বাসে) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের চিত্র পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ঢাকা শহরের বাসে একটি জরিপ কাজ পরিচালনা করে। এই জরিপের উদ্দেশ্য হলো: ঢাকা শহরের বাসে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থার পর্যবেক্ষণ ও আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বাস মালিক সমিতি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রতিপালনের প্রমাণভিত্তিক তথ্য সরবরাহ করা। ঢাকা শহরের ২২টি রুটে ৪১৭টি ননএসি বাসে ক্রস সেকশ্যনাল জরিপ কার্যটি পরিচালিত হয়। জরিপ পরিচালনার সময় দৃশ্যমান হয় যে ৯১.৩ শতাংশ বাস চালক ও হেলপারগণ সরাসরি বাসে ধূমপান করে থাকে। ১০০ শতাংশ পাবলিক পরিবহণ (বাস)-য়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ পাওয়া যায়নি। সর্বপোরি ১০টি বাসের মধ্যে প্রায় ৯টি বাসেই ধূমপানের নিদর্শণ পাওয়া যায়। এ জরিপ ফলাফল থেকে প্রতিয়মান হয় যে ঢাকা শহরের ১০০ শতাংশ পাবলিক পরিবহণে (বাসে) তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এভাবে প্রতিদিন অগণিত মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে পাবলিক পরিবহনে।

ছবি : সংগৃহীত, নেট থেকে

বিআরটিএ কর্তৃপক্ষকে পাবলিক পরিবহণে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের লঙ্ঘন সম্পর্কে প্রমাণভিত্তিক তথ্য সরবরাহ করা ও বিআরটিএ কর্তৃক আরোও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গত ৭ সেপ্টেম্বর বিআরটিএ অফিসে উক্ত জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করা হয়

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সকল পাবলিক পরিবহন শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখতে হবে। শুধুমাত্র পাবলিক পরিবহণে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হচ্ছে ৪৪ শতাংশ (২ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ)। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আইন সম্পর্কে সচেতনতা কম, তামাকজাত পণ্যের ব্যাপক প্রচারণা, তামাকজাত দ্রব্যের সহজলভ্যতা এবং সর্বোপরি আইনের সঠিক ও যথাযথ বাস্তবায়ন তুলনামূলক স্বল্প। এই জরিপ ফলাফল থেকে উল্লেযোগ্য সুপারিশমালা হচ্ছে আইন ভঙ্গ করলে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিতকরণ, রুট পারমিট এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পাবলিক পরিবহনে শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ রাখার পাশাপাশি পরিবহণ চালক ও শ্রমিকদের সচেতন করতে নানামূখী উদ্যোগ গ্রহণ করা।

এই জরিপের উদ্দেশ্য হলঃ ঢাকা শহরের রেস্তোঁরায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থার পর্যবেক্ষণ ও আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসক, রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ, মালিক সমিতি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রতিপালনের প্রমাণভিত্তিক তথ্য সরবরাহ করা।

উল্লেখ্য, পাবলিক পরিহণকে ধূমপানমুক্ত রাখতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সরকারি পর্যায়ে পাবলিক পরিবহণকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা, এ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান, ধূমপানমুক্ত সাইনেজ প্রদর্শনে নির্দেশনা প্রদান, ড্রাইভারদের আইন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি। বিআরটিএ কর্তৃপক্ষকে পাবলিক পরিবহণে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের লঙ্ঘন সম্পর্কে প্রমাণভিত্তিক তথ্য সরবরাহ করা ও বিআরটিএ কর্তৃক আরোও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গত ৭ সেপ্টেম্বর বিআরটিএ অফিসে উক্ত জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করা হয় যেখানে বিআরটিএর চেয়ারম্যান, পরিচালক, প্রশিক্ষণ ,উর্ধবতন কর্তৃপক্ষ, বাস মালিক সমিতি, **ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য** ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক, সিটিএফকের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য ষ্টেকহোল্ডারগণ উপস্থিত ছিলেন।

পাবলিক পরিবহণে তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত বেইজলাইন সার্ভে প্রতিবেদন প্রকাশ ও করণীয় শীর্ষক সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ

রেস্তোরাঁয় পরোক্ষ ধূমপানের শিকার প্রায় ২ কোটি ৫৮ লক্ষ মানুষ

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তামাকজাতদ্রব্য ব্যবহার জাতীয় অর্থনীতি ও পরিবেশের ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলছে। সারা বিশ্বে সমন্বিতভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ২০০৩ সালের মে মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৫৬ তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলনে Framework convention on Tobacco control (FCTC) চুক্তি অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ সরকার ২০০৩ সালে FCTC চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং ২০০৪ সালে অনুস্বাক্ষর করে। বাংলাদেশ এই চুক্তির প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ এবং এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন করে। ২০১৩ সালে আইনটি সংশোধন করা হয় এবং ২০১৫ সালে বিধি প্রনয়ণ করে বাংলাদেশ সরকার। আইনের ধারা - ৪ অনুযায়ী, পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ; ধারা - ৭ (ক) অনুযায়ী, পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণের মালিক/ তত্বাবধায়ক/ব্যবস্থাপক তার পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণকে ধূমপানমুক্ত রাখবেন; ধারা-৮ অনুযায়ী, সকল পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণে সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন বাধ্যতামূলক এবং ধারা - ৫ অনুযায়ী, যেকোনো উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের সকল ধরনের বিজ্ঞাপন, প্রচার-প্রচারণা ও প্রণোদনা নিষিদ্ধ। কিন্তু এ আইন মানছে না রেস্তোরাঁরাসমূহ।

ঢাকা শহরের প্রায় শতভাগ (৯৮ শতাংশ) রেস্তোরাঁয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর এই জরিপে। ২০১৯ সালের জুন মাসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক 'ঢাকা শহরের রেস্তোরাঁয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা যাচাইয়ের জন্য 'ক্রস সেকশনাল' পদ্ধতিতে একটি জরিপ

কার্য পরিচালিত হয়। এই জরিপের উদ্দেশ্য হলো: ঢাকা শহরের রেস্তোরাঁয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থার পর্যবেক্ষণ ও আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসক, রেস্তোরাঁয় কর্তৃপক্ষ, মালিক সমিতি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কাছে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রতিপালনের প্রমাণভিত্তিক তথ্য সরবরাহ করা।

ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার মোট ৩৭১টি (উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২১১টি এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১৬৬টি) রেস্তোরাঁয় পরিচালিত হয় এই জরিপ। যার মধ্যে ২৪৫টি রেস্তোরাঁর ট্রেড লাইসেন্স আছে আর বাকী ১২৬টি রেস্তোরাঁর কোনো ট্রেড লাইসেন্স নেই। এই ৩৭১টি রেস্তোরাঁর ৯৮ শতাংশ-তে সামগ্রিকভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘনের চিত্র উঠে আসে অর্থাৎ মাত্র ২ শতাংশ রেস্তোরাঁয় যথাযথভাবে আইন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আরো দেখা গিয়েছে যে ৩৪ শতাংশ রেস্তোরাঁয় ধূমপানের সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়, ১৭.৩ শতাংশ রেস্তোরাঁয় সরাসরি ধূমপানের দৃশ্য দেখা যায়; ২৯.৪ শতাংশ রেস্তোরাঁয় সিগারেটের উচ্ছিষ্ট অংশ/ছাই দানি পাওয়া গিয়েছে এবং ২.৬ শতাংশ রেস্তোরাঁয় ধূমপানের গন্ধ পাওয়া গিয়েছে। ৯৮% রেস্তোরাঁয় আইন অনুযায়ী সতর্কতামূলক নোটিশ পাওয়া যায়নি এবং ৯২ শতাংশ রেস্তোরাঁয় কোনো ধরনের সতর্কতামূলক নোটিশ পাওয়া যায়নি। ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আইন লঙ্ঘনের হার যথাক্রমে ৩৩.২ শতাংশ ও ৩৫.৬ শতাংশ । ট্রেড লাইসেন্স আছে এমন রেস্তোরাঁয় আইন লঙ্ঘনের হার ৩১.৪ শতাংশ এবং ট্রেড লাইসেন্সবিহীন রেস্তোরাঁয় হার ৩৯.৭ শতাংশ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছেন, "২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ তামাকমুক্ত হবে"। আর এটি বাস্তবায়ন এবং আইনের শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এই জরিপ কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও কতৃপক্ষের নিকট কিছু সুপারিশমালা তুলে ধরে- তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সিটি কর্পোরেশনের বাজেটে সুনির্দিষ্টভাবে অর্থ বরাদ্দ রাখা এবং রেস্তোরাঁ মালিক ও কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সভা আয়োজন, বিভিন্ন উপকরণ প্রকাশ ও বিতরণ করা; রেস্তোরাঁয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ ; সকল রেস্তোরাঁকে ট্রেড লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা এবং লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রতিপালনের শর্ত আরোপ করা এবং প্রতিবেদন প্রদান বাধ্যতামূলক করা; একটি মনিটরিং টিম গঠন এবং তামাক আইন বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিনিয়ত মনিটর করা; কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে সকল স্বাস্থ্য পরিদর্শককে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণের নির্দেশনা প্রদান এবং পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন সংগ্রহ; আইন যথাযথ বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ যেমন: নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা, আইন অমান্যে ট্রেড লাইসেন্স বাতিল, ট্রেড লাইসেন্স বইয়ে শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা; আইন অমান্যে মৌখিক/লিখিত নোটিশ প্রদান বা মামলা রুজু করাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ। প্রস্তাবিত সুপারিশমালা ও আইন বাস্তবায়নে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ২০২০ সালের জুন মাসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর তিনটি মতবিনিময় সভার মাধ্যমে এই জরিপের তথ্য ও সুপারিশসমূহ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি ও সাংবাদিকদের কাছে উপস্থাপন করে। এরই আলোকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন তামাক নিয়ন্ত্রণে যে যে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সবগুলো পদক্ষেপই গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি রেস্তোরাঁ আছে। এদেশে প্রায় ২ কোটি ৫৮ লক্ষ মানুষ শুধুমাত্র রেস্তোরাঁয় পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়। এছাড়া হসপিটালিটি সেক্টরের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অধূমপায়ীরা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়। অন্যদিকে তামাক কোম্পানী বিভিন্ন বড় বড় হোটেলে নানান রকম প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে যা আইনত নিষেধ এবং দন্ডনীয় অপরাধ। ইতোমধ্যে হসপিটালিটি সেক্টরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের সকল রেস্তোরাঁকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণাসহ রেস্তোরাঁসমূহ ধূমপানমুক্ত রাখার জন্য "রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা" গঠন ও রেস্তোরাঁকে পাবলিক প্লেস হিসেবে আইনে অন্তর্ভূক্তকরণে সরকারকে অনুরোধ, বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক হসপিটালিটি সেক্টরের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন কৌশলপত্র প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ণে সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি। এ সকল পদক্ষেপের ফলে রেস্তোরাঁয় পরোক্ষ ধূমপানের হার হ্রাস পেতে শুরু করেছে। ২০০৯ সালের গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস)-র প্রতিবেদনে রেস্তোরাঁয় পরোক্ষ ধুমপানের হার ছিল প্রায় ৮০ শতাংশ এবং ২০১৭ সালের গ্যাটস-এর জরিপে এ হার হ্রাস পেয়ে হয় প্রায় ৫০ শতাংশ । তাই বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে এবং শুধুমাত্র রেস্তোরাঁয় ২ কোটি ৫৮ লক্ষ মানুষকে পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি হতে রক্ষায় প্রয়োজন আর একটু সচেতনতা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কঠোর পদক্ষেপ।

বাংলাদেশে প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি রেস্তোরাঁ আছে। এদেশে প্রায় ২ কোটি ৫৮ লক্ষ মানুষ শুধুমাত্র রেস্তোরাঁয় পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন। এছাড়া হসপিটালিটি সেক্টরের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অধূমপায়ীরা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন। অন্যদিকে তামাক কোম্পানী বিভিন্ন বড় বড় হোটেলে নানন রকম প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে যা আইনত নিষিদ্ধ এবং দন্ডনীয় অপরাধ।

মো. মোখলেছুর রহমান, সহকারী পরিচালক

মুসলিম জীবনে হিজরী সন ও চান্দ্র তারিখের গুরুত্ব

মুফতী শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান হিজরী সন তথা আরবী তারিখ ও চান্দ্র মাসের সাথে সম্পর্কিত। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও আনন্দ-উৎসবসহ সব ক্ষেত্রেই মুসলিম উম্মাহ হিজরী সনের ওপর নির্ভরশীল। যেসব উপাদান মুসলিম উম্মাহকে উজ্জীবিত করে তন্মধ্যে হিজরী সন অন্যতম। বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর কৃষ্টি-কালচারে ও মুসলিম জীবনে হিজরি সনের গুরুত্ব অপরিসীম। হিজরী সনের সাথে মুসলিম উম্মাহর তাহজীব-তামাদ্দুনিক ঐতিহ্য সম্পৃক্ত।

মানুষের জীবন সময়ের সমষ্টি। সময়কে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহারোপযোগী করে আল্লাহ তায়ালা প্রাকৃতিকভাবে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন: দিন রাত, মাস, বছর ইত্যাদি। বছরকে আমরা সাল বা সনও বলি। বছর শব্দটি মূল হলো উর্দূ বরছ, সাল শব্দটি ফারসী এবং সন শব্দটি আরবী; বাংলায় বর্ষ, বৎসর ও অব্দ ব্যবহৃত হয়। আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। (সূরা-৯ তাওবা, আয়াত: ৩৬)। 'তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং উহাদের মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বৎসর গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার। আল্লাহ ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এ সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন। (সুরা ইউনুস, আয়াত: ৫)। 'আর সূর্য ভ্রমন করে উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, ইহা পরাক্রমশালী সবজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল; অবশেষে উহা শুষ্ক বক্র পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে।' (সূরা-৩৬ ইয়া-সীন, আয়াত: ৩৮-৩৯)।

প্রাচীন আরবে সুনির্দিষ্ট কোন সন প্রথা প্রচলিত ছিল না। বিশেষ ঘটনার নামে বছরগুলোর নামকরণ করা হতো। যেমন বিদায়ের বছর, অনুমতির বছর, হস্তীর বছর ইত্যাদি। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) যখন খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন বহু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত নতুন নতুন রাষ্ট্র ও ভূখন্ড ইসলামী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাষ্ট্রের জরুরি কাগজপত্র ইত্যাদিতেও কোন সন তারিখ উল্লেখ না থাকায় অসুবিধা হতো। ঐতিহাসিক আল বেরুনী কর্তৃক বিধৃত একটি বিবরণী থেকে জানা যায় যে, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) একটি পত্রে উমর (রা.) এর কাছে অভিযোগ করেন, আপনি আমাদের কাছে যেসব চিঠি পাঠাচ্ছেন সেগুলোতে কোন সন তারিখের উল্লেখ নেই, যার কারণে আমাদের অনেক অসুবিধা হয়। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে খলীফা হযরত উমর (রা.) একটি সন চালুর ব্যাপারে সচেষ্ট হন। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা শিবলী নোমানী (র.) হিজরী সনের প্রচলন সম্পর্কে তার সুপ্রসিদ্ধ 'আল ফারূক' গ্রন্থে উল্লেখ করেন: হযরত উমর (রা.) এর শাসনামলে ১৬ হিজরী সনের শাবান মাসে খলীফা উমরের কাছে একটি দাপ্তরিকপত্রের খসড়া পেশ করা হয়, পত্রটিতে মাসের উল্লেখ ছিল; সনের উল্লেখ ছিল না। তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন খলিফা জিজ্ঞাসা করেন, পরবর্তী কোনো সময়ে তা কীভাবে বোঝা যাবে যে, এটি কোন সনে তার সামনে পেশ করা হয়েছিলো? এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর না পেয়ে হযরত উমর (রা.) সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য শীর্ষ পর্যায়ের জ্ঞানী-গুণীদের নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেন। এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় হিজরতের ১৬ বছর পর ১০ জুমাদাল উলা মুতাবিক ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে। হিজরতের বছর থেকে সন গণনার পরামর্শ দেন হযরত আলী (রা.)। তৎকালে আরবে অনুসৃত প্রথানুযায়ী পবিত্র মুহাররম মাস থেকে ইসলামী বর্ষ শুরু (হিজরী সনের শুরু) করার ও জিলহজ্ব মাসকে সর্বশেষ মাস হিসেবে নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন হযরত উমান (রা.)। (বুখারি ও আবু দাউদ)।

ছবি : সংগৃহীত, নেট থেকে

দ্রষ্টব্য: ইসলামপূর্বযুগে প্রথম দুই মাসের নাম ছিল 'সফর আউওয়াল ও সফর সানী' (صَفَرُ الْاَوَّلُ وَ صَفَرُ الثَّانِيْ)। প্রথম মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু আরবের লোকেরা তাদের সুবিধা মতো

এ মাস দুটি আগে পরে নিয়ে যেতো, যুদ্ধ করার সুবিধার্থে। তাই পরবর্তীতে তাদের এ কুটকৌশল নিবারণ হেতু প্রথম মাসের নাম করণ করা হয় মুহাররম (নিষিদ্ধ); সাথে সাথে দ্বিতীয় মাসের 'সানী' (দ্বিতীয়) শব্দটিও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ফলে এ দুমাসের নাম বর্তমান রূপ লাভ করে।

হিজরী সন মূলত চান্দ্রবর্ষ নির্ভর। চান্দ্র মাস ২৯ ও ৩০ দিনে হয় বিধায় ৩৫৪ বা ৩৫৫ দিনে বর্ষ পূর্ণ হয়। তাই চান্দ্র বর্ষ ও সৌর বর্ষ সাধারণত ১০ বা ১১ দিনের পার্থক্য হয়। সৌদী আরব ও ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্য দূর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলিম দেশগুলোতে হিজরী চান্দ্র বর্ষের পাশা পাশি হিজরী সৌর বর্ষও ব্যবহৃত হয়। এ দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিধায় এতে অসুবিধা হয় না, বরং সুবিধা হয়। বাংলা সনও হিজরী সন থেকে উদ্ভূত; যদিও এতে সময় বিজ্ঞানের মৌলিক সূত্র রক্ষা করা হয়নি।

হিজরী সন ও বাংলা সন: একটি ছোট্ট ভুল-

বাংলা সনের সূচনা মোঘল সম্রাট আকবরের আমলে। তৎকালীন রাজ সভার পন্ডিত মোল্লা ফতেহ উল্লাহ সিরাজী সম্রাটের নির্দেশে এর প্রবর্তন করেন। তার পূর্ব পর্যন্ত ভারত বর্ষে মুসলিম শাসকগণ হিজরী চান্দ্র বর্ষ ব্যবহার করতেন। চান্দ্র মাসের হিসাব অনুযায়ী প্রতিবছর ১০ বা ১১ দিন এগিয়ে যেতো। এভাবে প্রতি তিন বছরে ১ মাস এগিয়ে আসতো বছর। তখন অর্থনীতির প্রধান খাত ছিলো কৃষি। রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস ছিলো উশর, জাকাত ও খাজনা, খারাজ। খাজনা আদায়ের উপযুক্ত সময় ছিলো ফসল তোলার সময়। কিন্তু হিজরী চান্দ্র বর্ষের শুরু-শেষ সব সময় ফসল তোলার সময়ে হয় না বিধায় খাজনা আদায়ে অসুবিধা হতো। এ সমস্যা সমাধানের জন্য মহামতি আকবর হিজরী চান্দ্র বর্ষকে হিজরী সৌর বর্ষে রূপান্তরের জন্য একটি নতুন পঞ্জিকার প্রয়োজন অনুভব করেন এবং পন্ডিত মোল্লা ফতেহ উল্লাহ সিরাজীকে এই পঞ্জিকা প্রবর্তনের দায়িত্ব দেন।

পন্ডিত ফতেহ উল্লাহ সিরাজী হিজরী সনকে মূল ধরে তৎকালে প্রচলিত সৌরবর্ষের বাংলা মাসগুলোকে ব্যবহার করে এবং সম্রাট আকবরের সিংহাসনারোহনের বছরকে প্রথম বছর ধরে একটি পঞ্জিকা প্রবর্তন করেন; যার নাম দেন হিজরী বাংলা সন বা ফসলী সন। কালের বিবর্তনে তা আজ বাংলা সন বা বাঙালা সাল তথা বঙ্গাব্দ হিসেবে পরিচিত।

সম্রাট আকবরের সিংহাসনারোহনের সনটি ছিল ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ ১০ বা ১১ মার্চ। এবং ফতেহ উল্লাহ সিরাজীর ক্যালেন্ডারে যাকে হিজরী সৌরবর্ষ- ৯৯১ ধরা হয়েছে। কথা হলো সৌরবর্ষ হয় ৩৬৫ দিনে আর চান্দ্রবর্ষ হয় ৩৫৪ বা ৩৫৫ দিনে। তবে পিছনের ঐ ৯৯০ বছরকে সৌরবর্ষে রূপান্তরিত করতে গেলে আনুমানিক ৩০ বছর বিয়োগ করতে হতো, তা কিন্তু করা হয়নি। সুতরাং বর্তমান বাংলা সনটি হিজরী চান্দ্রবর্ষ হিসেবে যেমন ঠিক থাকলো না তেমনি সঠিকভাবে হিজরী সৌর বর্ষেও রূপান্তরিত হলো না। তবুও এটি মুসলিম পন্ডিত কর্তৃক প্রণীত মুসলিম শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত মুসলিম জনগণের ফরজ ইবাদাত উশর ও জাকাত আদায়ের নিমিত্তে ব্যবহৃত সন।

ইসলামী পর্বসমূহ ও আমাদের ইবাদাত বন্দেগী সম্পূর্ণভাবে হিজরী তারিখ ও চান্দ্র মাসের সাথে সম্পর্কিত। যেমন: আশুরা, আখেরী চাহারশোম্বা, ফাতেহায়ে দোয়াজদাহুম, ফাতেহায়ে ইয়াজদাহুম, শবে মিরাজ, শবে বরাত, শবে কদর, রমজান, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, ইয়াওমুল আরাফা, হজ, উমরা, কুরবানী, জাকাত ও ফিৎরা ইত্যাদি। আইয়ামেবীদসহ বিভিন্ন নফল নামাজ, নফল রোজা ও নফল ইবাদাতের জন্যও আরবী তারিখ জানা প্রয়োজন।

তাই আরবী তারিখের হিসাব রাখা জানাজা নামাজের মতোই ফরজে কেফায়া। অর্থাৎ প্রত্যেক পরিবারে বা প্রতি বাড়িতে অন্তত একজনকে এই আরবী তারিখের হিসাব রাখতে হবে, না হলে সকলেই ফরজ তরকের পাপের অপরাধী হবেন। তবে সওয়াব শুধু তারাই পাবেন যারা হিসাব রাখবেন।

আরবী ১২ মাসের নাম:

প্রচলিত নাম		পূর্ণনাম		অর্থ
মহররম	مُحَرَّم	মুহাররমুল হারাম	الْمُحَرَّمُ الْحَرَامُ	মহাসম্মানিত
সফর	صَفَر	সফরুল মুযফফার	صَفَرُ الْمُظَفَّرُ	বর্ণিল সাফল্য
রবীউল আউওয়াল	رَبِيعُ الْأَوَّل	রবীউল আউওয়াল	رَبِيعُ الْأَوَّل	প্রথম বসন্ত
রবীউস সানী	رَبِيعُ الثَّانِي	রবীউস সানী	رَبِيعُ الثَّانِي	দ্বিতীয় বসন্ত
জুমাদিউল আউওয়াল	جُمَادِى الْأَوَّل	জুমাদাল উলা	جُمَادَى الْأُولَى	প্রথম গ্রীষ্ম
জুমাদিউস সানী	جُمَادِى الثَّانِي	জুমাদাল উখরা	جُمَادَى الْأُخْرَى	দ্বিতীয় গ্রীষ্ম
রজব	رَجَب	রজবুল মুরাজ্জাব	رَجَبُ الْمُرَجَّب	মহামহিমান্বিত
শাবান	شَعْبَان	শাবানুল মুআজ্জম	شَعْبَانُ الْمُعَظَّم	মহিমাময় সবুজ
রমজান	رَمَضَان	রমজানুল মুবারক	رَمَضَانُ الْمُبَارَك	বরকতময় দহনজ্বালা
শাউওয়াল	شَوَّال	শাউওয়ালুল মুকাররম	شَوَّالُ الْمُكَرَّم	সম্মানজনক সুসম্পর্ক
জিলকদ	ذِى الْقَعْد	জুলকাদা	ذُو الْقَعْدَة	প্রশান্তি বিশ্রাম
জিলহজ্জ	ذِى الْحَجّ	জুলহিজ্জাহ	ذُو الْحِجَّة	হজ্জসম্পন্ন

মুফতী মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী
যুগ্ম-মহাসচিব: বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি
সহকারী অধ্যাপক: আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফীজম
smusmangonee@gmail.com

হোটেল-রেস্তোরাঁয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের শতভাগ বাস্তবায়নের দাবি

এভিয়েশন ও ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনলাইন আলোচনা সভায় বক্তারা

২১ জুলাই ২০২০, এভিয়েশন ও ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে "ঢাকা শহরের রেস্তোরায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের চিত্র পর্যবেক্ষণ জরিপের ফলাফল ও গণমাধ্যমের ভূমিকা" শীর্ষক এক অনলাইন আলোচনা সভায় হোটেল-রেস্তোরাঁয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের শতভাগ বাস্তবায়ন ও আইনের দূর্বল দিক সংশোধনের দাবি জানায় এভিয়েশন ও ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশ (এটিজেএফবি) সদস্যবৃন্দ। সভায় অংশ নেয় ফোরামের সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। সভা পরিচালনা করেন ও সভার উদ্দেশ্য তুলে ধরনে এভিয়েশন ও ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশের সভাপতি ও এটিএন বাংলার বার্তা সম্পাদক নাদিরা কিরণ। তিনি আরো বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রনয়ণ, বাস্তবায়ন ও সংশোধনে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর হোটেল, রেস্তোরাঁ, পর্যটন কেন্দ্র এগুলো বিনোদনের জন্য এবং এসকল স্থানে জনসমাগমও বেশি। তাই এসকল সেক্টরকে তামাকমুক্ত রাখা প্রয়োজন। তামাকমুক্ত রাখতে জনসচেতনা বৃদ্ধি ও আইন বাস্তবায়নে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে গণমাধ্যম অতীতেও কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতে আরো সক্রিয় হয়ে কাজ করবে। সভায় জরিপের ফলাফল তুলে ধরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারি পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো: মোখলেছুর রহমান। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছেন, "২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ তামাকমুক্ত হবে"। অন্যদিকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় গত বছর হসপিটালিটি সেক্টরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করে। যেখানে বলা হয়েছে যে, হসপিটালিটি সেক্টরের অধীন সকল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের কথা ও দিক নির্দেশনা।

সভায় উপস্থিত এটিজেএফবি-এর সদস্যবৃন্দ সকলেই একটি বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন করে হোটেল, রেস্তোরাঁ ও পর্যটন কেন্দ্রগুলোসহ হসপিটালিটি সেক্টরকে সম্পূর্ণরূপে তামাকমুক্ত রাখা এবং কোনো প্রকার ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান রাখা নিষিদ্ধ করা। তাহলেই হসপিটালিটি সেক্টর সম্পূর্ণরূপে তামাকমুক্ত হবে। অন্যথায় বর্তমান আইনের দূর্বল দিকগুলোর সুযোগ সকলেই নিবে এবং আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা কঠিন হবে।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন প্যাসিফিক এশিয়া ট্রাভেল এসোসিয়েশনের (পাটা বাংলাদেশ চ্যাপটার) চেয়ারম্যান এবং ঢাকা রিজেন্সি হোটেল ও রিসোর্টের নির্বাহী পরিচালক শহিদ হামিদ, সাভার পৌরসভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শরফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর গ্রান্টস ম্যানেজার আব্দুস সালাম মিয়া ও প্রোগ্রাম অফিসার আতাউর রহমান মাসুদসহ তামাকবিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। সভার বিশেষ অতিথি শহিদ হামিদ বলেন, স্বনামধন্য হোটেলগুলোর প্রায় সবই তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে চলে। তারপরও কিছু কিছু স্থানে এখনো পুরোপুরি ভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না সেজন্য আইন সম্পর্কে আরো প্রচার ও প্রচারণার প্রয়োজন। আব্দুস সালাম মিয়া সেই সাথে একমত পোষণ করেন এবং বলেন জনসচেতনা তৈরিতে যেমন গণমাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা প্রয়োজন তেমনি বর্তমান আইনের যে দূর্বল দিকগুলো আছে যেমন- সকল রেস্তোরাকে পাবলিক প্লেসের আওতায় নিয়ে আসা এবং হসপিটালিটি সেক্টর থেকে ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান নিষিদ্ধ করাসহ তামাকজাত পণ্যের প্রদর্শন আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা ইত্যাদি সংশোধন আনয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সভার সভাপতি ইকবাল মাসুদ বলেন, তামাক স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এটা সকলের জানা সত্ত্বেও পাবলিক প্লেসে তামাক সেবন অহরহ দেখা যায় যা আইন পরিপন্থী। সম্প্রতি আহ্ছানিয়া মিশনের জরিপে রেস্তোরাঁয় এমন চিত্র দেখা গিয়েছে যা ভাববার বিষয়। যেহেতু গ্যাটস ২০১৭ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী রেস্তোরাঁয় পরোক্ষ ধূমপানের হার প্রায় ৫০% তাই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন রেস্তোরাঁকে বেছে নিয়েছে যেখানে আইনের শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা গেলে এই হারটা হ্রাস করা সম্ভব। তবে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ও সংশোধনে সরকারকে যেমন সক্রিয় ও কঠোর হতে হবে তেমনি গণমাধ্যমকেও এর প্রয়োজনীয়তা সরকারসহ সাধারণ জনগণের নিকট তুলে ধরতে হবে।

মাদকের অপব্যবহার প্রতিরোধে এডভোকেসি সভা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আয়োজনে লাইট হাউস কনসোর্টিয়ামের যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত 'ড্রাগ এবিউজ রেসিসটেন্ট অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং (দাড়াও) 'প্রকল্পের আওতায় ৭ আগস্ট ২০২০ জুম অনলাইনের মাধ্যমে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে মাদকের অপব্যবহার প্রতিরোধে সম্মিলিত প্রচেষ্টা বিষয়ক এডভোকেসি সভা আয়োজন করা হয়।

ইউএসএইড এবং ইউকেএইড-এর আর্থিক সহায়তায় কাউন্টারপার্ট ইন্টারন্যাশনাল কতৃর্ক বাস্তবায়নাধীন প্রোমোটিং অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড রাইটস (পার) কর্মসূচির আওতায় রাজশাহী ও নাটোর জেলায় দাড়াও প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ে

বাস্তবায়ন করছে। সভায় এনজিও বিষয়ক ব্যুরো মহাপরিচালক মো. রাশেদুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিরোধ শিক্ষার পরিচালক মু. নুরুজ্জামান শরীফ এবং জাতিসংঘের মাদকবিরোধী প্রতিষ্ঠান ইউএনওডিসির ন্যাশনাল কোর্ডিনেটর মো. আবু তাহের। এ ছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন সেভ দ্য চিলড্রেন এর টেকনিক্যাল এডভাইজার, এজাজুল ইসলাম চৌধুরীসহ অন্যান্যরা।

মাদক বিরোধী কর্মসূচির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে এডভোকেসি সভায় মূল বিষয়ে সচিত্র উপস্থাপনা করেন ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

সভায় কাউন্টারপার্ট ইন্টারন্যাশনাল এর সিনিয়র প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট সৈয়দ সুলতান চাঁদ বক্তব্য প্রদান করেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন লাইট হাউজের প্রধান নিবার্হী মো. হারুন-অর-রশিদ।

'দাড়াও' প্রকল্পের আয়োজনে গণমাধ্যম কর্মীদের বৈঠক

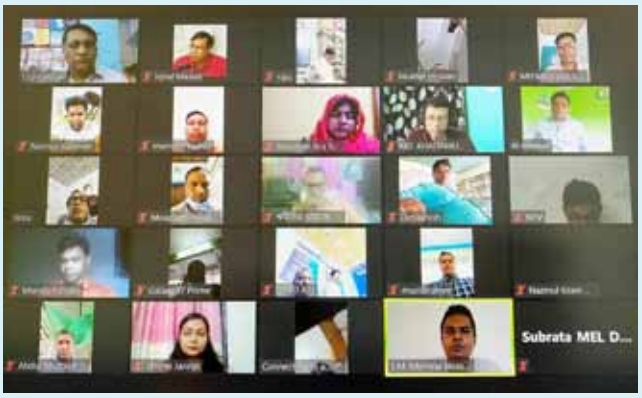

'দাড়াও' প্রকল্পের আয়োজনে নাটোর জেলার সাংবাদিকদের সাথে অনলাইন বৈঠক

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আয়োজনে লাইট হাউস কনসোর্টিয়াম-যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী কার্যক্রম 'ড্রাগ এবিউজ রেসিসটেন্ট অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং (দাড়াও)' প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৬ আগস্ট জুম অনলাইনের মাধ্যমে নাটোর জেলার সাংবাদিকদের সাথে এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। ইউএসএইড এবং ইউকেএইড-এর আর্থিক সহায়তায় কাউন্টারপার্ট ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রোমোটিং অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড রাইটস (পার) কর্মসূচির আওতায় রাজশাহী ও নাটোর জেলায় প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে। গোলটেবিল বৈঠকে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে গোলটেবিল বৈঠকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর জেলার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. আলমগীর হোসেন।

সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন লাইট হাউজের নির্বাহী প্রধান মো.হারুন-অর-রশিদ। এরপর সভার মূল বক্তব্য তুলে ধরে উপস্থাপনা করেন দাড়াও প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. মনোয়ার হোসেন। গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন গনমাধ্যমের ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

বক্তারা বলেন, মাদকের ভয়াল থাবা থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। তারা গণমাধ্যম কর্মীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

কারাগারে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ শুরু

মহামারী কোভিড-১৯ রোগ মোকাবেলার অংশ হিসেবে কারাভ্যন্তরে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও সাধারণ কর্মীদের দৈহিক ও মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা এবং ইহার প্রতিরোধে প্রস্তুতি বিষয়ক চলমান অনলাইন প্রশিক্ষনের ৭ম ব্যাচের চারদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ ১৬ই আগস্ট ২০২০ শুরু হয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, জিআইজেড বাংলাদেশ, ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর রেডক্রস ও কারা অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত এবং বৃটিশ ও জার্মান সরকারের যৌথ অর্থায়নে রুল-অফ-ল প্রোগ্রামের অধীনে ইমপ্রুভমেন্ট অব দ্যা রিয়েল সিচুয়েশন অব ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজন ইন বাংলাদেশ (আইআরএসওপি) প্রকল্পের মাধ্যমে। ৭ম ব্যাচের প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন মো. কামাল আতাহার হোসেন, উপ-প্রধান, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাহেরা ইয়াসমিন, ডিরেক্টর-অপারেশনশ, রুল-অব-ল প্রোগ্রাম, জিআইজেড বাংলাদেশ, আমিরুল ইসলাম, সহকারী কারা মহাপরিদর্শক (প্রশিক্ষণ ও ক্রিয়া), কারা অধিদপ্তর ও ডা. সাইহা মারজিয়া, হেলথ ফিল্ড অফিসার, হেলথ কেয়ার-ইন-ডিটেনসন, ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর রেডক্রস। অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

তামাকমুক্ত বাংলাদেশ ২০৪০ গড়তে আইন বাস্তবায়ন ও করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহাপরিচালক

তামাকমুক্ত দেশ গড়তে আরো সক্রিয় হবে এনজিও ব্যুরো : মহাপরিচালক

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বাংলাদেশ সরকার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ প্রণয়ন করে এবং আইনটিকে আরো বেশি কঠোর ও কার্যকর করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে আইনটি সংশোধন ও ২০১৫ সালে বিধি প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান স্পীকার সামিট ২০১৬ তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া বক্তব্যে অঙ্গিকার প্রদান করেন "২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করা হবে"। প্রধানমন্ত্রী এ ঘোষণাকে বাস্তবায়ন করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, এমন মন্তব্য করেন মহাপরিচালক মো. রাশেদুল ইসলাম। ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ আগারগাঁও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে "তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও করণীয়" শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এমন মন্তব্য করেন।

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে এ সভায় সভাপতিত্ব করেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পরিচালক (প্রকল্প-১) ড. মো. হেলাল উদ্দিন এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী ও সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।

মো. মোখলেছুর রহমান বলেন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে যার মধ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ অন্যতম। এই তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের সাথে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও একসাথে কাজ করে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক তামাক কোম্পানী ফিলিপ মরিস ফাউন্ডেশন ফর স্মোক ফ্রি ওয়ার্ল্ড নামক সংস্থা গঠন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন এনজিওকে আর্থিক অনুদান প্রদান করছে। ফাউন্ডেশন ফর এ স্মোক ফ্রি ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক, চাইল্ড সাইট ফাউন্ডেশন (সিএফএস) ও টেলেনর হেলথকে অনুদান প্রদান করে। ব্রাক ও টেলেনর হেলথ পরবর্তীতে অনুদানের অর্থ ফেরত দিয়ে দেয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ, তামাক শিল্প এবং জনস্বাস্থ্যের মধ্যে স্বার্থেও মৌলিক দ্বন্দ্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন্ধ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলি বলেছে য়ে তামাক শিল্প বা তামাক শিল্পের স্বার্থকে সামনে রেখে কাজ করা বেসরকারি সংস্থার সাথে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জড়িত নয় এবং জড়িত হবে না।" কিন্তু তামাক নিয়ন্ত্রণের নামে তামাক কোম্পানির অনুদান গ্রহণ বিপজ্জনক এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করতে ফিলিপ মরিস ফাউন্ডেশনের স্মোক ফ্রি ওয়ার্ল্ড -এর কার্যক্রম বড় বাধা।

চূড়ান্ত হলো সাতক্ষীরা পৌরসভার স্বাস্থ্যসেবা কৌশলপত্র

সাতক্ষীরা পৌরসভার স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত কৌশলপত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ সাতক্ষীরা পৌরসভার আয়োজনে ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহযোগিতায় পৌরসভাকে একটি স্বাস্থ্যসম্মত মডেল পৌরসভা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে স্বাস্থ্যসেবা কৌশলপত্র চূড়ান্তকরণ বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালার সভাপতি পৌর মেয়র মো. তাজকিন আহমেদ চিশতি বলেন ''সাতক্ষীরা পৌরসভার স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে কৌশলপত্র প্রণয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়নে বিশেষ করে সমাজের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্টির স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকল্পে এ কৌশলপত্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এটি এসডিজি-৩ এর অধীন ১৩টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে"।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাতক্ষীরা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ও জেলার ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. মো. জাহাঙ্গীর হোসেন। তিনি বলেন, "সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব যা বাস্তবায়নে কৌশলপত্রটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে"।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। তিনি বলেন, "স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে এবং এই কৌশলপত্রটি সাতক্ষীরা পৌরসভার স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কৌশলপত্রটি সভায় উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান। সাতক্ষীরা পৌরসভার সচিব মো. সাইফুল ইসলাম বিশ্বাস, বস্তী উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. জিয়াউর রহমান, স্যানিটারী ইন্সেপেক্টর মো. রবিউল ইসলাম, সাতক্ষীরা ক্লিনিক এ্যাণ্ড ডায়াগনষ্টিক এ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি ডাঃ মো. হারিবুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী মো. কামরুজ্জামান রাসেলসহ পৌর এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের প্রতিনিধিবৃন্দ, স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পথশিশুদের মধ্যে মিশনের ঈদ উপহার বিতরণ

২৯ জুলাই ২০২০, টার্কিশ কো-অপারেশন এন্ড কোঅর্ডিনেশন এজেন্সি-এর সহযোগিতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ড্রপ-ইন-সেন্টারের দুই শতাধিক সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়। উপহার প্যাকেজের মধ্যে ছিল, একটি স্কুলব্যাগ, পাঞ্জাবী, প্যান্ট, এক জোড়া জুতা, একটি ক্যাপ এবং প্রতিটি শিশুর জন্য একটি মাস্ক এবং মেয়ে শিশুদের জন্য ছিল, একটি স্কুলব্যাগ, একটি ফ্রক, একটি জুতা, একটি হিজাব এবং প্রত্যেকের জন্য একটি মাস্ক।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ওসমান তুরান, টার্কিশ কো-অপারেশন এন্ড কোঅর্ডিনেশন এজেন্সির সমন্বয়কারী ড. ইসমাইল গুনদোওদু, মোহাম্মদপুর ৩৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সেলর আসিফ আহমেদ, সিএমসি সভাপতি আবুল হোসেন, ডাম-এর শিক্ষা ও টিভেট সেক্টরের প্রধান মো. সাহিদুল ইসলাম, ডিআইসি প্রকল্পের সমন্বয়কারী শেখ মহব্বত হোসেন ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাম-এর সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমান।

টার্কিশ কো-অপারেশন এন্ড কোঅর্ডিনেশন এজেন্সি ড. ইসমাইলু গুনদোওদু বলেন, "আমরা প্রায় দুইশতাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি যা বাংলাদেশের পুরো অঞ্চল জুড়ে রয়েছে। আমরা বাংলাদেশের সকল শিশুকে হাসি-খুশী দেখতে চাই। বাংলাদেশে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ওসমান তুরান বলেন, একটি মুসলিম দেশ হিসেবে তুরস্ক ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাল সম্পর্ক রয়েছে এবং এই ভ্রাতৃত্বেও প্রতীক হিসেবে আমরা এই সুন্দর ঈদ উপহার বিতরণ করতে আসছি। এখন করোনার মহামারী আমাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করেছে আপনাদেও উচিত মাস্ক পরা ও নিরাপদ থাকা।" ডাম-এর সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমান বলেন, "মানবিক সংস্থা হিসেবে ডাম সর্বদা সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পথশিশুদের জন্য ডাম প্রচুর কাজ করছে, আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাবার, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান করছি। এমন কি আমরা শিশুদের জন্য নিরাপদ ড্রপ-ইন-সেন্টার এবং নাইট সেল্টার স্থাপন করেছি। পাশাপাশি, আমাদের একটি ক্যান্সার হাসপাতাল রয়েছে যা বাংলাদেশের বৃহত্তম ক্যান্সার হাসপাতাল। আমরা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা ও প্রদান করছি"। অনুষ্ঠান শেষে ডিআইসির শিশুরা একটি মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক নৃত্য পরিবেশন করে।

তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ওসমান তুরান পথশিশুদের মধ্যে ঈদ উপহার সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন

এতিম শিশুদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার চারটি ইউনিয়নে (নওয়াপাড়া, দেবহাটা, কুলিয়া এবং পারুলিয়া) Penny Appeal-এর অর্থায়নে এক বছর মেয়াদী Orphan Kind Project টি গত মার্চ ২০২০ তারিখ থেকে বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পের ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, মঙ্গলবার, ১০০ জন এতিম শিশুদের মাঝে উপজেলা হাদিপুর আহ্ছানিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল- চাউল, ডাল, তৈল, ডিম এবং কলা।

উক্ত বিতরণ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. জহুরুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি মেম্বার মো. হান্নান। অনুষ্ঠানে সুচনা বক্তব্য রাখেন এরিয়া ম্যানেজার (ডিএফইডি) মো. সেলিম হোসেন এবং সঞ্চালনা করেন প্রকল্প সমন্বয়কারী, Orphan Kind Project মো. আব্দুল কাদের। প্রধান অতিথি বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এ ধরনের উদ্যোগ নি:সন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। এ প্রকল্পের মাধ্যমে এতিম শিশুরা ভালোভাবে পড়াশোনা করে তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তিনি আরও বলেন, উপজেলা প্রশাসন এ প্রকল্পে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে যাবে।

অরফান কাইন্ড প্রজেক্টের উদ্যোগে সাতক্ষীরায় এতিম শিশুদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের অধীনে ফায়েল খায়ের প্রকল্পের দিনব্যাপী করোনা বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী

ফায়েল খায়ের প্রকল্পের করোনা বিষয়ক দিনব্যাপী

রেসপন্স ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মী প্রশিক্ষণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের অধীনে ফায়েল খায়ের প্রকল্প একটি নতুন প্রকল্প। ঢাকা জেলার মোহাম্মদপুর ও মিরপুর এবং নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর ফিল্ড অফিসে এই শিক্ষা কার্যক্রম আগামী পাঁচ বছর (জুলাই-২০২০ হতে জুন-২০২৫) পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে। এই কার্যক্রমে ৭৫টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, ৭৫টি প্রাথমিক শিক্ষা ও ৪৫টি নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা বাস্তবায়িত হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ফায়েল খায়ের প্রকল্পের দিনব্যাপী করোনা-১৯ রেসস্পন্স ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মী প্রশিক্ষণ মিরপুর ফিল্ড অফিসে গত ২৩ আগস্ট ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। ফায়েল খায়ের প্রকল্পের করোনা-১৯ রেসস্পন্স ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মী প্রশিক্ষণে মোট ৩২ জন অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে ২০ জন পুরুষ ও ১২ জন নারী। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন প্রকল্পের সুপারভাইজার, টেকনিক্যাল অফিসার, মাস্টার ট্রেইনার ও কেন্দ্রীয় প্রকল্প টিমের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ।

প্রকল্পের কেন্দ্রীয় অফিসের আয়োজনে এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছেন সংশ্লিষ্ট টেকনিক্যাল টিমের সদস্যগণ। এই প্রশিক্ষণকে সফল ও সার্থক করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ, কারিগরি সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন শিক্ষা ও টিভেট সেক্টরের হেড মো. সাহিদুল ইসলাম। প্রশিক্ষণত্তোর করণীয় ও আয়োজনের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোদাচ্ছের হোসেন মাছুম।

প্রশিক্ষণের বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন ফায়েল খায়ের প্রকল্পের কেন্দ্রীয় টিমের শেখ শফিকুর রহমান, কো-অর্ডিনেটর, মনিটরিং এন্ড ইভ্যালিউয়েশন; শাহীন আক্তার, কো-অর্ডিনেটর, বেসিক এডুকেশন; মো. নূরুল ইসলাম, কো-অর্ডিনেটর, ট্রেনিং এবং প্রশান্ত ডেভিড সাধু খাঁ, প্রোগ্রাম অফিসার, চাইল্ড রাইটস এন্ড প্রোটেকশন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন

"কোভিড-১৯ সংকট ঃ সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০২০ পালনের জন্য জুম ওয়েবিনারের মাধ্যমে ভার্চুয়াল সেমিনারের আয়োজন করে। ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ আয়োজিত সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহছানুর রহমান ও সভাপতিত্ব করেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমান। আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ইউনিসেফের ইসিডি স্পেশালিস্ট মোহাম্মদ মোহসিন, ডাম হেলথ ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ ও আহ্ছানিয়া মিশন কলেজের অধ্যক্ষ মফিজুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডাম-এর এডুকেশন এন্ড টিভেট সেক্টরের প্রধান মো. সাহিদুল ইসলাম।

সেমিনারের প্রথমেই শেখ শফিকুর রহমান, কো-অর্ডিনেটর এমএন্ডই, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২০-এর প্রতিপাদ্য বিষয়টি সামনে রেখে একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনায় ডাম-এর দূরশিক্ষণ কার্যক্রম তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদ মোহাম্মদ মোহসিন বলেন "আশির দশক থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তথা ডাম-এর প্রেসিডেন্ট রফিকুল আলম ও আমি একযোগে সাক্ষরতা নিয়ে কাজ করেছি। আমরা কেউই কোনদিন ভাবিনি এভাবে আমাদেরকে সাক্ষরতা দিবস পালন করতে হবে। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। সেমিনারের সভাপতি ড. এস এম খলিলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, ডাম বলেন- "সরকার তথা দাতা সংস্থাগুলোর এখনি এগিয়ে আসার সময়। শিক্ষা ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে হলে, নিরাপদ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে অর্থের যোগান দিতে হবে।

এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আহছানিয়া মিশন কলেজের প্রিন্সিপাল মো. মফিজুর রহমান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনলাইন সেমিনারে বক্তারা

আবু হানিফ মোল্লা

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।
আবু হানিফ মোল্লা ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সহকারী প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে যোগদান করেন।
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মজগতের দীর্ঘ এই পথচলায় বিভিন্ন পদে থেকে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। সর্বশেষ তিনি আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালে কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। মিশনের সাথে দীর্ঘ ৩০ বছরের সম্পৃক্ততায় সকল শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাথে ছিল তার সুহৃদ সম্পর্ক।

আবু হানিফ মোল্লা

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও পুত্রসন্তান রেখে যান। তার একমাত্র পুত্র পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। স্ত্রীও কর্মজীবী।

আবু হানিফ মোল্লা ১৯৬০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গোপালগঞ্জ জেলার মোকসেদপুর উপজেলার সলিনাবোক্সা ইউনিয়নের খরিকাইন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মো. ইমাজউদ্দিন মোল্লা। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬১ বছর।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। এরপর শুরু হয় কর্মজীবন।
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে যোগদানের পূর্বে তিনি বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, দি ফাউন্ডেশন ফর রিসার্চ অন এডুকেশনাল প্লানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এফআরইপিডি), বাংলাদেশসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন।

মো. হাবিবুর রহমান

মো. হাবিবুর রহমান গত ২৫ জুলাই ২০২০ নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, বাবা-মা, ভাই-বোন এবং অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪২ বছর।
মো. হাবিবুর রহমান ১৯৭৮ সালের ৭ই জানুয়ারি মানিকগঞ্জ হেলার হরিরামপুর থানার হেলাচিয়া ইউনিয়নে ডাংগি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিন ভাই, এবং এক বোনের মধ্যে মো. হাবিবুর রহমান ছিলেন সবার বড়। তিনি এক পুত্র সন্তানের জনক।

মো. হাবিবুর রহমান

লেখাপড়া জীবন শেষ করে তিনি কর্ম জীবন শুরু করেন ২০০১ সালে। যেহেতু তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারেননি তাই তিনি কর্মজীবন শুরু করেন ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার আশুলিয়ায় একটি গার্মেন্টসে চাকরি দিয়ে।
২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে প্রথম বাইপাইল শাখায় জেএফও হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ঢাকা এরিয়ার মোকছেদপুর শাখায় বদলী হন। এরপর তিনি ঢাকা এরিয়ার কেরানীগঞ্জ শাখায় ২০১৭ সালে শাখা ব্যাবস্থাপক হিসেবে প্রমোশন পান। তিনি তার কর্মময় জীবন শুরু থেকে কৃতিত্বের সহিত কাজ করে গেছেন। সর্বশেষ তিনি কেরানীগঞ্জের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালনরত ছিলেন।

Save for Hajj, হজ্বের জন্য সঞ্চয়

হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শরিয়াহ্‌ভিত্তিক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)

আমাদের সেবাসমূহ

হজ্ব সঞ্চয় প্রকল্প ও অন্যান্য আমানত প্রকল্প

পবিত্র হজ্বব্রত পালনে অর্থায়ন (আস্-সাফারী)

যানবাহনে অর্থায়ন

গৃহায়নে অর্থায়ন

শিল্পায়নে অর্থায়ন

ব্যবসা বাণিজ্যে অর্থায়ন

আমানত সেবাসমূহ

১. আল-ওয়াদিয়া হজ্ব সঞ্চয় হিসাব
২. মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব
৩. মুদারাবা মাসিক হজ্ব সঞ্চয় হিসাব
৪. মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব
৫. মুদারাবা মেয়াদী আমানত হিসাব
(৩ মাস/৬ মাস/এক বছর/দুই বছর/তিন বছর)
৬. মুদারাবা মুনাফা উত্তোলনযোগ্য মেয়াদী আমানত হিসাব
(এক বছর/দুই বছর/তিন বছর)
৭. মুদারাবা দ্বিগুন মুনাফা ভিত্তিক মেয়াদী আমানত হিসাব

বিনিয়োগ সেবাসমূহ

খাতসমূহ

১. ইজারা ওয়া ইক্‌তিনা
২. বাই-মুয়াজ্জাল
৩. হায়ার পারচেজ-শিরকাতুল মিল্‌ক
৪. বাই-মুরাবাহা

পণ্য

১। গাড়ী (ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক)
২। যন্ত্রপাতি (শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত)
৩। ব্যবসা বাণিজ্য
৪। বাড়ি/ফ্ল্যাট/বাণিজ্যিক ফ্লোর নির্মাণ ও ক্রয়
৫। আস্-সাফারী (হজ্ব অর্থায়ন প্রকল্প)

আপনি কি পবিত্র হজ্ব পালনে ইচ্ছুক?
হজ্ব পালন সহায়তাকল্পে সমুদয় খরচের ৭০% পর্যন্ত টাকা
শরিয়াহ্‌ভিত্তিকভাবে আমরা অর্থায়ন করে থাকি।
যাহা ৩৬ মাসে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

যোগাযোগ করুন:
ফজলুর রহমান সেন্টার, ৭২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৫৫২১৪১, ৯৫৬০৫২০, ৯৫৭৭৮০৯, ৭১১৪৩৬১।

www.hajjfinance.net

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা
রেজিঃ নং ৬০/৭৯ ॥ বর্ষ ৪২ ● সংখ্যা ৩ ● জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : বছরে যে কোন সময় আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা।
সম্পাদক, আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০